Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৫

AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ

মাসিক

আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০১৪

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

উন্মত্ত হিংসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ

গত ১৬ই ডিসেম্বর সকালে পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুলে 'তাহরীকে তালেবান পাকিস্তান' (টিটিপি) হামলায় বার্ষিক পরীক্ষারত ১৩২ জন শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-অভিভাবক ও কর্মকর্তা মিলে ১৪৫ জনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমরা গভীর ভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। আমরা এ ঘটনার নায়কদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানাই। হিংস্র মানুষ যে হিংস্র পশুর চাইতে নিকৃষ্ট এটা তার অন্যতম প্রমাণ। ঘটনার নায়ক ছয়জন আত্মঘাতিকে তাদের নেতারা শহীদ ও জাতীয় বীর আখ্যা দিয়েছে এবং আরও এরূপ হামলা হবে বলে পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। ওদিকে পাক সেনাপ্রধান ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩০০০ তালেবান জঙ্গিকে ফাঁসিতে ঝুলাবার জন্য সেদেশের সরকারের প্রতি আল্টিমেটাম দিয়েছেন এবং ঘটনার পরদিন থেকেই তাঁর হুকুমে তালেবান এলাকায় সমানে বিমান হামলা চলছে। তাতে গত কয়দিনে শতাধিক মরেছে ও মরছে। ১৯৭১-এ টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীদের কণ্ঠে যে হুংকার আমরা শুনেছিলাম, আদমী নেহী, মেট্টী চাহিয়ে' আজও সেকথাই শুনছি পাক সেনাপতির কণ্ঠে। সেদিনের সেই যুলুমের পরিণতিতে তারা পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছিল। কিন্তু তাদের শিক্ষা হয়নি। সেনাপতি বুঝেন না যে, তিন হাযার মারলে বহু হাযার মরবে। এমনকি তার নিজের পরিবার ও সন্তানেরাও হামলার শিকার হতে পারে। কেননা হিংসা কেবল হিংসাই আনয়ন করে। ওদিকে পাক সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ড বাতিলের আইন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে এখন কারাগারে থাকা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকশ' তালেবানের ফাঁসি দ্রুত কার্যকর করা হবে। সব মিলিয়ে পাকিস্তানে নতুন করে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে সরকার বনাম তালেবানের মধ্যে। পার্থক্য এই যে, সরকার জনগণের কাছে ও আইনের কাছে দায়বদ্ধ। তালেবানরা তা নয়। তাই তারা যা পারে, সরকার তা পারবে না। অতএব এ যুদ্ধে সরকার হারবে এটা নিশ্চিত। অবশেষে তারা হয় সন্ধি করবে অথবা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর এটাই ইসলামের শত্রুদের লক্ষ্য। তালেবানরা বলেছে 'স্বজন হারানোর বেদনা বুঝাতেই তারা এ হামলা করেছে'। কারণ সরকার তাদের উপর আমেরিকার বিমান হামলা বন্ধ করতে পারেনি। তদুপরি আমেরিকাকে খুশী করতে গিয়ে গত কয়েক বছর ধরে সরকার তাদের উপর সেনা হামলা চালাচ্ছে। ইতিপূর্বে রাতের অন্ধকারে হামলা করে সেনাবাহিনী তাদের ৮৬ জনকে এক সাথে হত্যা করেছে। সেনা পরিচালিত যারব-ই-আযব অপারেশনে

ইতিমধ্যে ১৬০০ তালেবান ও নারী-শিশু নিহত হয়েছে। তারা বলছে, এখন আমরা প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমাদের কোন সহযোগীকে ফাঁসি দেওয়া হলে প্রধানমন্ত্রীর পরিবার সহ পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও সেনা কর্মকর্তাদের সন্তানদের হত্যা করা শুরু হবে। আমরা নেতাদের গৃহগুলিকে শোকের আধারে পরিণত করব'।

মুশকিল হ'ল এই যে, উভয় পক্ষ ইসলামের দাবী করছে। তালেবানরা তাদের ভাষায়, তাগূতী সরকার হটিয়ে ইসলামী খেলাফত কায়েমের জন্য 'জিহাদ' করছে। অন্যদিকে পাক সরকার ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত দেশটিতে ইসলাম টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তালেবানদের হত্যা করছে। অথচ এখানে কেবলই রয়েছে ক্ষমতার লড়াই, ইসলামের কিছু নেই। কেননা ইসলামের জন্য হলে ইসলামী বিধান ও নীতি-আদর্শ মেনে চলতে হয়। বিগত ৬৬ বছর যাবত পাকিস্তান খ্রিষ্টানী রাজনীতি ও ইহূদী অর্থনীতি অনুসরণ করছে। তারা নগ্নভাবে পরাশক্তিগুলির খেলনায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তালেবানরাও আমেরিকার সৃষ্টি। তাদেরকে ব্যবহার করেই তারা আফগানিস্তান থেকে রাশিয়াকে হটাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এখন তারাই হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে 'সন্ত্রাসী'। যে পাক সরকার তাদেরকে কাজে লাগিয়েছে, তারাই এখন তাদেরকে মারছে পাশ্চাত্যকে খুশী করার জন্য। পাকিস্তান সরকার সেদেশে ইসলামী শাসন কায়েম করেনি, এটা সুস্পষ্ট। কিন্তু তালেবান যারা ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা কি ইসলামী বিধান মেনে তাদের কথিত জিহাদ পরিচালনা করছে?

ইসলামের প্রতিশোধ নীতি কি? আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে অতটুকু নাও যতটুকু তোমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ছবর কর, তাহলে সেটাই ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম হবে' *(নাহল ১৬/১২৬)*। এখানে সরকার ও তালেবান উভয় পক্ষই ইসলামের ধৈর্যধারণ নীতি লংঘন করেছে। তিনি বলেন, একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। অথচ তালেবানরা মারল নিরপরাধ শিশুদের। এটাতো কাফেরদের নীতি। গত ৮ই জুলাই'১৪ থেকে ৫১ দিন ব্যাপী একতরফাভাবে ইস্রাঈল গাযায় বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ছাড়াও সেখানে প্রায় আড়াই হাযার মুসলিমকে হত্যা করে। তার মধ্যে প্রায় ৮০০ শিশু-কিশোর এবং অসংখ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী-পুরুষ ছিল। তখন কিন্তু বিশ্বশান্তির মোড়লরা কিছুই বলেনি। কেননা এগুলি তাদের যুদ্ধনীতিতে কোন অপরাধ নয়। কিন্তু ইসলামী শাসন কায়েমকারীরা কোন অজুহাতেই ইসলামী বিধান লংঘন করতে পারে না।

ইসলামের যুদ্ধনীতি কি? 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে আল্লাহভীতির নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে গমন কর এবং যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের সাথে যুদ্ধ কর... *(মুসলিম)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা... বাড়াবাড়ি করবে না, শিশু-কিশোরদের হত্যা করবে না, গীর্জার অধিবাসী কোন পাদ্রী-সন্ন্যাসীকে, কোন মহিলাকে এবং কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না *(আহমাদ, বায়হাক্বী)*। আরেকটি বিষয় হ'ল, সরকার ও তালেবান দু'পক্ষের বিধান কি সমান? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজ অপসন্দনীয় মনে করে, সে যেন তাতে ছবর করে' *(বুখারী, মুসলিম)*। অতএব সরকার যুলুম করলেও তাতে ধৈর্য ধারণ করাই হ'ল ইসলামের নীতি। সবশেষে পাকিস্তান সরকার কি কাফের? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে *(বুখারী, মুসলিম)*। এক্ষণে কোন মুসলিম সরকার ইসলাম কায়েম না করলে তারা বেশীর বেশী ফাসেক, যালেম বা মুনাফিক হতে পারে। কাফের কখনোই নয়। তাদের রক্ত হালাল নয়। মায়েদাহ ৪৪ আয়াতে যে তাদেরকে 'কাফের' বলা হয়েছে, তার অর্থ ঐ কাফের নয়, যার জন্য তারা ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যায়। এটাই হ'ল ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা। তাছাড়া ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে একই অপরাধে তাদের 'যালেম' ও 'ফাসেক' বলা হয়েছে। কিন্তু তালেবানরা মুসলিম সরকারকে সরাসরি তাগূত ও কাফের বলছে। বিভিন্ন দেশে তাদের অনুসারীরা একই আক্বীদা পোষণ করে। ফলে তাদের এই চরমপন্থী আক্বীদা ও হঠকারী কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলাম সর্বত্র প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যার সুযোগ নিচ্ছে বিরোধীরা।

এক্ষণে দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় কি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা? না। বরং সে পথ হ'ল, উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা। সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা। অবশেষে যালেম সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা'। মনে রাখতে হবে, মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ফরয, ইসলামকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো মুমিনের উপর ফরয করা হয়নি। আমাদের দাওয়াত জনগণ কবুল করলে এবং আমাদের নিঃস্বার্থপরতায় আল্লাহ খুশী হলে তিনি যেকোন সময় আমাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসাবেন। এটা তাঁর এখতিয়ার। অতএব সকলের প্রতি আবেদন, চরমপন্থা ও হঠকারিতা পরিহার করুন। মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

(গত সংখ্যার পর)

৩. মালদহ বিদ্রোহ মামলা :

ভারতের বিভিন্ন এলাকা ও শহরে মুজাহিদগণের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল মালদহ। এই কেন্দ্রটি বঙ্গ প্রদেশে ছিল। Our Indian Musalmans গ্রন্থের ইংরেজ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার ১৮৭০ সালের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে *(উর্দূ অনুবাদ : হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ১১৯)* লিখছেন যে, ওহাবীদের জিহাদ আন্দোলনের এই কেন্দ্রটি 'প্রায় ৩০ বছর' পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১] এই হিসাবে ১৮৪০ সালের দিকে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মালদহ যেলা ছাড়াও এর সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী যেলার কিছু অংশও এই কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ...এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীর খলীফা মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবী। যিনি মুজাহিদগণের জামা'আতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি এই সূত্রে দক্ষিণ বাংলার মালদহ যেলায় গেলে সেখানে মুজাহিদগণের খিদমতের জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল মনে হয় এবং সেই যেলার একটি গ্রামে তিনি আবাস গাড়েন। সেখানেই বিবাহ করেন এবং শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন।[২] গ্রামের ছোট-বড় জমিদার ও অন্যান্য লোকজন তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন শুরু করে। হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি দারুণ তেজস্বী বক্তা ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ঢঙ্গে মানুষজনকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানাতেন। এর ফল এই হয়েছিল যে, অসংখ্য যুবক তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি লোকজনের নিকট থেকে রীতিমত অর্থ আদায় করে আযীমাবাদ (পাটনা) কেন্দ্রে পাঠাতেন। যাতে এই অর্থ সীমান্তবর্তী মুজাহিদগণের নিকট পৌঁছানো যায়।

মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সকল ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রফীক মণ্ডল।[৩] কয়েক বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৮৫৩ সালে মুজাহিদগণকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে রফীক মণ্ডলের

---

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, অনুবাদ : এম. আনিসুজ্জামান (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০০), পৃঃ ৬৬।-অনুবাদক।*

২. মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবী মূলতঃ মালীহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ-এর মানুষ ছিলেন। পাটনা কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে তাঁকে মালদহ অঞ্চলে দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি দিলালপুর কেন্দ্রের (বিহার, ভারত) মুজাহিদ নেতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ আযীমাবাদীর কন্যাকে বিবাহ করেন। সেখানে অবস্থিত শামসুল হুদা মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা করতেন এবং গোপনে মুজাহিদ প্রশিক্ষণ দিতেন। বাংলা অঞ্চলের জিহাদ সংগঠক রফীক মণ্ডলকে তিনিই খেলাফত দিয়ে যান। খ্যাতনামা আলেম গাযী মাওলানা আব্দুল মান্নান ও মাওলানা আব্দুল হান্নান দিলালপুরী (মৃঃ ২৫শে নভেম্বর ১৯৮২) আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর পুত্র ছিলেন। দ্রঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ৪০৯, ৪২৭ (টীকা ৩০) ও ৪৪২-৪৪৩।-অনুবাদক।*

৩. রফীক মণ্ডল ওরফে রফী মোল্লা বিন বরকতুল্লাহ একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। হান্টার তাঁকে নিম্নশ্রেণীর কৃষক বলে উল্লেখ করেছেন *(দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃঃ ৬৬)*। মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করে তিনি জিহাদ আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিভাবান কর্মীতে পরিণত হন। বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত যেলা চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত নারায়ণপুর কেন্দ্রের (প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ ১৮৪০ খ্রিঃ) তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। ১৮৪০ সালের আগে-পিছে মাওলানা এনায়েত আলী আযীমাবাদীর হাতে তিনি জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং উত্তরবঙ্গে জিহাদ আন্দোলনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৩৬-৩৭)*। হান্টারের ভাষ্য অনুযায়ী ১৮৪৩ সালের মধ্যেই তাঁর অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার মাধ্যমে তিনি 'প্রায় আশি হাযার অনুগামীর এক বিরাট দল' গড়ে তুলেন, যারা 'প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করত' *(দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃঃ ৮৫)*। রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ এলাকায় জিহাদ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে ও সমাজ সংস্কারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তদানীন্তন সময়ে এসব এলাকার মুসলমানেরা শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। তারা হিন্দুদের মতো মাথায় টিকি রাখত। মেয়েরা নদীর তীরে কাপড় খুলে রেখে গোসল করতে নামত। দরগাহ ও পীরপূজায় সকলে অভ্যস্ত ছিল। তিনি ব্যাপক দাওয়াতী কর্মতৎপরতা গ্রহণ করে হুক্কা বন্ধ করেন। দরগাহ ও পীরপূজার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেন। মাথার টিকি কাটা শুরু করেন। নদীর পাড় থেকে নগ্ন মেয়েদের কাপড় বাড়ীতে এনে পরে তাদের স্বামীদের ডাকিয়ে নছীহত করে কাপড় ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি হলে কুচক্রীমহল ও বিদ'আতী-কবরপূজারী আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে শাসন কর্তৃপক্ষের কান ভারি করে তুলল। ফলে রফী মোল্লা ১৮৫৩ সালে গ্রেফতার হয়ে মুর্শিদাবাদ-এর জঙ্গীপুর জেলে নীত হন। কিন্তু অল্প দিন পরেই মুক্তি পান *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১০-১১, ৪১৩-১৪, ৪৩৬-৩৮)*। রফী মোল্লার পৌত্র স্বনামধন্য আলেম মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরী বলেন যে, ভারতের বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া সদর, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া যেলার বাইশী, ধরমগঞ্জ, দীঘলবাঁক, ছাহেবগঞ্জ যেলার বার হারোয়া থানা, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যেলার সূতী থানাধীন নূরপুর, সুজনীপাড়া, শেরপুর, বাহাদুরপুর প্রভৃতি এলাকা এবং পশ্চিম দিনাজপুর যেলার ইটাহার, রায়গঞ্জ, করণদীঘি, গোয়ালপুকুর, চোপড়-ইসলামপুর, গঙ্গারামপুর, তপন প্রভৃতি থানা সমূহের নদী তীরবর্তী এলাকা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের গল্‌গলিয়া রেলস্টেশনের বিপরীতে নেপালের ঝাপ্পা ও ভদ্রপুর থানার বহুলোক তাঁর ও তাঁর পুত্র আমীরুদ্দীনের তাবলীগে আহলেহাদীছ হয়েছেন। রফী মোল্লা তাঁর ২য় স্ত্রীর ছেলে শুকরুদ্দীনকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সিত্তানা মুজাহিদ ঘাঁটিতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বাড়ী ফিরে এলে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মোল্লাজী কথাবার্তা বন্ধ করে দেন এবং সেই বেদনায় মর্মাহত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই চাঁপাই নারায়ণপুরে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরে নদীগর্ভে কবরটি বিলীন হয়ে যায় *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৩৭, ৪৪০)*। রফী মোল্লার জীবদ্দশায় তাঁর ১ম স্ত্রীর ছেলেরা অর্থাৎ কামীরুদ্দীন, আমীরুদ্দীন ও শামসুদ্দীন বিহারের আগলই নারায়ণপুরে চলে আসেন। ২য় স্ত্রীর ছেলে শুকরুদ্দীন গাযী, সাখাওয়াতুল্লাহ ও মুহাম্মাদ আলী মণ্ডলের বংশধরগণের অনেকে রফী মোল্লার ইন্তেকালের প্রায় ত্রিশ বছর পরে নদী ভাঙ্গনের ফলে নারায়ণপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আগলই- নারায়ণপুরে তাদের অংশের প্রাপ্য ২২ বিঘা জমি বিক্রি করে বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর যেলার ইটাহার থানাধীন শ্রীমন্তপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন *(ঐ, পৃঃ ৪৪০)*।-অনুবাদক।

Contents

উপর সরকারের সন্দেহ হয়। তাঁকে তল্লাশি করা হলে এমন কিছু চিঠিপত্র উদ্ধার হয় যার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মুজাহিদগণের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এজন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিন পর তিনি মুক্তি পেলে যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ- যা তিনি নিজে আঞ্জাম দিতেন, স্বীয় পুত্র মৌলভী আমীরুদ্দীনকে সোপর্দ করে দেন।

মৌলভী আমীরুদ্দীন অত্যন্ত চৌকস ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রভাবের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। গঙ্গা নদীর উভয় তীর ও উহার দ্বীপ সমূহে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী যেলায় তাঁর সুগভীর প্রভাব ছিল। তাঁর একনিষ্ঠতা ও কর্মোদ্দীপনার কারণে সবাই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখত...।[4] মৌলভী আমীরুদ্দীন জিহাদের জন্য যে সকল ব্যক্তিকে সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। অবশ্য হান্টারের বক্তব্য হল মুজাহিদগণের একটি সীমান্ত ঘাঁটির ৪৩০ জন ব্যক্তির মধ্যে কমবেশী শতকরা ১০ শতাংশ ওহাবী মুজাহিদ তাঁরই প্রেরিত ছিল।[5]

বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে মুজাহিদগণকে সম্মানদানের প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যেত। এর বড় কারণ এটা ছিল যে, ইতিপূর্বে মাওলানা এনায়েত আলী আযীমাবাদী এই অঞ্চলসমূহে অনেক কাজ করেছিলেন। লোকজনের উপর তাঁর সততা ও একনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের দারুণ প্রভাব ছিল।[6]

---

৪. রফী মোল্লার পুত্র মৌলভী আমীরুদ্দীন পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত জিহাদ আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং উল্লিখিত এলাকা সমূহে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার ফলে তাঁর তত্ত্বাবধানে মালদহ কেন্দ্রটির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায় এবং বাস্তবিকই এটি বাংলার সকল যেলাভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর একটি প্রসিদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সেজন্য পাটনার নেতৃবৃন্দ তথা মাওলানা এনায়েত আলী, ফাইয়ায আলী ও মাকছূদ আলী জিহাদ সংগঠনের কাজে এখানে এসেই অবস্থান করতেন *(ড. কিয়ামুদ্দীন আহমাদ, হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ১৮৪-১৮৫)*। ১৮৬৮ সালের দিকে আমীরুদ্দীনের আন্দোলন কেমন সুসংগঠিত ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তার কিছুটা স্বীকৃতি হান্টার-এর রিপোর্টে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, ‘বর্তমানে একটিমাত্র প্রদেশের (বঙ্গদেশের) ওহাবীদের উপরে নযর রাখা এবং তাদের তৎপরতাকে সীমার মধ্যে রাখতে গিয়ে ইংরেজ সরকারকে যে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, তার পরিমাণ স্কটল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি বৃটিশ যেলার বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও ফৌজদারী অপরাধ দমনের কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তার সমান। ষড়যন্ত্র (অর্থাৎ আন্দোলন) এত ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে যে, এর কোথায় শুরু, তা বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। প্রতিটি যেলা কেন্দ্রে হাযার হাযার পরিবারের মাঝে অসন্তোষের বিষ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এই তৎপরতার একমাত্র সম্ভাব্য সাক্ষী হচ্ছে এর কর্মীরা, যারা তাদের নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করে’ *(দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃঃ ৮৫)*। ১৮৭০ সালের মালদহ মামলার সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘প্রথম থেকে বিচারের সময় পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করার কাজে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দেন’ *(ঐ, পৃঃ ৬৭)*। ১৮৭০ সালে আমীরুদ্দীন গ্রেফতার হন এবং মুর্শিদাবাদ জেলে নীত হন। তাঁর গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে স্বীয় ভাতিজা মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরীর মত হল- তিনি নারায়ণপুর মারকাযের নিকটবর্তী শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত তেররশিয়া-দুর্লভপুর অঞ্চলে তাবলীগী সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রামের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত ছিল। খানাপিনার সময় বাড়ীওয়ালা প্রথানুযায়ী তার প্রথম সন্তানসম্ভবা পুত্রবধূর জন্য তার বাপের বাড়ী থেকে প্রেরিত বিশেষভাবে তৈরি বিরাট আকারের গুড়ের ‘বাতাসা’ তাঁকে খেতে দেন। তিনি এটাকে কুসংস্কার বলে ফিরিয়ে দেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে বাড়ীওয়ালা ক্ষুব্ধ হন এবং স্থানীয় থানার মুসলমান দারোগা মুর্তযা এবং জনৈক নুরু ফকীরের বাপ ওমর ফকীর-এর মাধ্যমে গোপনে স্থানীয় ইংরেজ প্রতিনিধিকে জানিয়ে দেন যে, এই ব্যক্তি রাজদ্রোহ প্রচার করেন এবং ‘খোরাসানে’ (আফগান সীমান্তের মুলকা-সিত্তানা মূল ঘাঁটিকে খোরাসান বা বড় গুদাম বলা হত) টাকা পাঠান। ফলে তিনি সেখানেই গ্রেফতার হন এবং জিজ্ঞাসাবাদে সবকিছু অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিলের মাধ্যমে তাঁকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজদ্রোহের বিষয়টি অস্বীকার করতে ইংগিত করেন, যাতে তাঁকে ‘পাগল’ বলে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তিনি রাযী হননি *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১২, ৪৩৯, ৪৫৯-৬০)*। তবে তাঁর গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে যে কথা এলাকায় প্রচলিত আছে তা এই যে, অন্যূন ২৫ কিলোমিটার দূরের ‘পাকুড়’ গ্রামের বিদ‘আতীরা তাদের প্রেরিত একজন ছাত্রের মাধ্যমে দিলালপুরের গোপন তথ্য জানতে পারে এবং ইংরেজ সরকারের কাছে তা ফাঁস করে দেয়। যার পরিণতিতে তাঁকে গ্রেফতার বরণ করতে হয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৪২)*। তাঁর বিচার কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হ’লে সেখানে তাকে ফাঁসির আদেশ শুনানো হয়। এতে খুশী হয়ে জোরে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে উঠলে উক্ত আদেশ রদ করে কালাপানিতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয় *(ঐ, পৃঃ ৪১২, ৪৬০)*। পরে সেখানকার একটি মাদরাসায় তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। একদিন তিনি ইংরেজ কর্মকর্তার ছেলেকে বললেন, তোমার আব্বা যে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন, সে কাজ এখনও চলছে না বন্ধ হয়েছে? ছেলের মুখে একথা শুনে উক্ত অফিসারের সুফারিশক্রমে ১১ বছর পরে তিনি মুক্তি পান। অন্যান্য বন্দীদের সাথে ছাড়া পেয়ে ১৮৮৩ সালের ৩রা মার্চে কালাপানির পোর্ট ব্লেয়ার ত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং যথাসময়ে বাড়িতে পৌঁছেন *(ঐ, পৃঃ ৪১২, ৪৩৯)*। অতঃপর নিজ জন্মস্থান পাটনায় থাকার আবেদন মঞ্জুর হলে তিনি মাওলানা আব্দুর রহীমের সাথে সেখানে থাকতে শুরু করেন। প্রত্যেক মাসে তাঁকে একবার স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর নিকট হাযিরা দিতে হত। পুলিশকে অবহিত না করে শহরের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি ছিল না *(হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩৩০)*। বিহারের ছাহেবগঞ্জের আগলই-নারায়ণপুরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৯)*। আমীরুদ্দীনের অনেক ভক্ত চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভোলাহাট থেকে হিজরত করে মালদহ যেলার বাট্‌না, কারবোনা প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করছেন- যারা সকলেই আহলেহাদীছ *(ঐ, পৃঃ ৪৩৭)*। রফী মোল্লা ও আমীরুদ্দীনের আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনকারী ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর থিসিসে বলেন, ‘রফী মোল্লা ও আমীরুদ্দীনের সূচিত আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সংগ্রহ করা সম্ভব না হ’লেও তার বাস্তব ফসল হিসাবে যা আমরা এখন প্রত্যক্ষ করি, তা এই যে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নাগরিক শিরক ও বিদ‘আত হ’তে তওবা করে মুসলিম ও ‘আহলেহাদীছ’ হয়েছেন এবং অদ্যাবধি বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চল সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবেই পরিচিত। তাদের মধ্যে এখনও শিরক ও বিদ‘আত বিরোধী মনোভাব বজায় আছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৩৮-৩৯)*।-অনুবাদক।

৫. *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃঃ ৬৮ ।-অনুবাদক।*

৬. মাওলানা বেলায়েত আলীর মেজভাই মাওলানা এনায়েত আলী ১৮৩৩-১৮৪৩ এবং ১৮৪৭-১৮৪৯ দু’বারে মোট বারো বছর বাংলাদেশ অঞ্চলে জিহাদের প্রচার ও সংগঠনে অতিবাহিত করেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪০৯, ৪৩৫)*। মাওলানার ভাতিজা মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী ‘তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ও ধৈর্যের সাথে ভ্রমণ করেছেন। তিনি লাখো মানুষকে অন্ধকার গহবর হতে টেনে এনে হেদায়াতের আলোকবর্তিকার একনিষ্ঠ প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের

১৮৭০ সালে মালদহে মাওলানা আমীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাঁর সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌তকরণ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসনের সাজা হয়েছিল। ১৮৭২ সালের মার্চে তিনি কালাপানি পৌঁছেন। দশ-এগারো বছরের যুলুম-নির্যাতন ও দেশান্তরের পর ১৮৮৩ সালে (১৩০০ হিঃ) তিনি কালাপানি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[৭] ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মুজাহিদগণকে সাহায্য করার অপরাধে ওহাবীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে এটি ছিল তৃতীয়। ইংরেজদের নিকট একে 'মালদহ বিদ্রোহ মামলা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

৪. রাজমহল বিদ্রোহ মামলা :

মালদহ বিদ্রোহ মামলার অল্প কিছুদিন পর ১৮৭০ সালে ওহাবীদের বিরুদ্ধে রাজমহলে[৮] চতুর্থ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলার মূল টার্গেট ছিলেন ইবরাহীম মণ্ডল।[৯] যিনি রাজমহল শহরতলীর ইসলামপুর নামক স্থানের

অনুসরণের প্রতি আগ্রহী করেছেন। তাঁর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও তাঁদের উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততিগণ আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত' *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৭১, ৩০১)*। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি পশ্চিম বাংলার দুম্‌কা ও মুর্শিদাবাদ যেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলাধীন নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন, 'আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হ'ল ও কার দ্বারা হ'ল? আমাকে বলা হ'ল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে' *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৭১, ৩০১-৩০২)*। গবেষক ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মাওলানা এনায়েত আলী সম্পর্কে বলেন, 'মাওলানার কর্মোদ্দীপনা ছিল কিংবদন্তীর মতো। যেকাজেই তাঁকে লাগানো হ'ত, সেকাজেই তিনি সেরা প্রমাণিত হ'তেন। যখন থেকেই তিনি আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন থেকেই এই জমিদারপুত্র সকল আরামকে হারাম করে আমীরের নির্দেশ মোতবেক দাওয়াত ও জিহাদের পথে জানমাল ওয়াক্‌ফ করে দেন। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার প্রায় সবটুকু সময় কেটেছিল বাংলাদেশ অঞ্চলে। দুইবার প্রায় একযুগ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তিনি যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন, তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তের সশস্ত্র জিহাদে বাঙ্গালী মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় যোগদান করে, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও জারি থাকে। বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক আহলেহাদীছ থাকার মূলে তাঁরই অবদান ছিল সবচাইতে বেশী। তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপ : একদা পাবনা শহরে তাবলীগে এসে তিনি 'চাপা মসজিদে' ওঠেন। সেদিন ছিল মাদার পীরের বাঁশ উঠানো উৎসব। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাট আকারে উৎসব চলছিল। মাওলানা সোজা উৎসবমঞ্চে উঠে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক দরদমাখা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। উৎসবের হোতা গাদল খাঁ সহ উপস্থিত শত শত লোক তওবা করে মাওলানার হাতে বায়'আত করেন। পাবনার রাধাকান্তপুরের উক্ত গাদল খাঁ ও তার পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আলী খাঁ আজীবন জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩০৩-৩০৪)*। তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জিহাদ আন্দোলনের আমীর মাওলানা এনায়েত আলী তৎকালীন যশোর যেলার হাকিমপুরকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া অঞ্চলে ব্যাপক তাবলীগী তৎপরতা চালাতে থাকেন। তিনি কোন এলাকায় গেলে প্রথমে নছীহতের মাধ্যমে তাদেরকে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত হবার আহ্বান জানাতেন। অতঃপর মসজিদ না থাকলে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন ও ইমাম নিয়োগ করতেন। ইমাম নিয়োগের পর তাঁর নেতৃত্বে জামা'আত কায়েম করতেন ও স্থানীয় যাবতীয় বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব উক্ত ইমামের উপরে ন্যস্ত করতেন *(ঐ, পৃঃ ৪১৪)*।-অনুবাদক।

৭. মুক্তির সময় তিনি স্মৃতি হিসাবে আন্দামানের ঝিনুক, শামুক, কড়ি ও কাঠের বাক্স নিয়ে আসেন। যা এখনো তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট মওজুদ রয়েছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১২, ৪১৯, ৪২৮, টীকা-৪৩)*।-অনুবাদক।

৮. রাজমহল প্রথমে মালদহ যেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সেটিকে মুর্শিদাবাদ যেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে তা বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগনার একটি সাব-ডিভিশন। গঙ্গা নদীর এপারে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ যেলা এবং ওপারে রাজমহল অবস্থিত। মালদহ ও রাজমহল কেন্দ্র দু'টি মিলেমিশে জিহাদ আন্দোলনের কাজ করত। দ্রঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৪০*।-অনুবাদক।

৯. ইবরাহীম মণ্ডল ছিলেন মূলতঃ নারায়ণপুরের নিকটবর্তী মুর্শিদাবাদ যেলাধীন লালগোলা থানার ঝাউডাঙ্গা গ্রামের বাশিন্দা। পরে তিনি সম্ভবতঃ ১৮৪০ সাল হতে ১৮৫৩ সালের রফী মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে রাজমহলের ইসলামপুরে (দিলালপুরের তিন মাইল উত্তরে) হিজরত করেন। তাঁর অনুরোধেই রফী মোল্লা দিলালপুরে হিজরত করেছিলেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪২৭-২৮, ৪৩৯-৪০)*। রফী মোল্লার পৌত্র মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরীর বক্তব্য অনুযায়ী রফী মোল্লা নিজ হাতে ইবরাহীম মণ্ডলের মাথার টিকির চুল কেটে 'আহলেহাদীছ' করেন এবং তাঁকে ঐ এলাকার দায়িত্বশীল হিসাবে বায়'আত নেন। এর ফলে ইবরাহীম মণ্ডলের দুই মেয়ের বিবাহ সংকট দেখা দিলে রফী মোল্লা নিজের দুই ছেলে কামীরুদ্দীন ও শামসুদ্দীনের সাথে তাদের বিয়ে দেন *(ঐ, পৃঃ ৪২৮, ৪৬০)*। জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী ইবরাহীম মণ্ডল ইসলামপুরে এসে চুপ থাকেননি। তিনি পাহাড়ীয়া অঞ্চলের লোকদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর নিরলস দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতার ফলে স্থানটি কালক্রমে মুজাহিদ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাছাড়া একদিকে প্রশস্ত নদী ও অপরদিকে দুর্গম পাহাড়ীয়া অঞ্চল হওয়ার কারণে স্থানটি মুজাহিদগণের ট্রেনিং ও আশ্রয় কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পাটনা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মাওলানা আহমাদুল্লাহ এখানে আসেন এবং ইবরাহীম মণ্ডলজীর পরামর্শক্রমে দুই মাইল দক্ষিণে 'দিলালপুর' নামক স্থানটিকে কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করেন ও সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন *(ঐ, পৃঃ ৪৪১)*। রাজমহলের সহকারী পুলিশ কমিশনার উইলমোট (Wilmot) পুলিশের ডিআইজি রেইলী-কে (Reily) অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ কমিশনার নবকেষ্ট ঘোষকে মালদহে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। ঘোষ সেখানে যান এবং এক সপ্তাহ অবধি রেশমী কাপড়ের ঝুট ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে বহু তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন। তিনি তথ্য সংগ্রহকালে অবগত হন যে, কালিয়া চকের (মালদহ) কয়েকটি গ্রামে জিহাদের জন্য ফাণ্ড সংগ্রহ করা হয়। অত্র এলাকায় নাযীর সরদার নামে এক ব্যক্তি চাঁদা সংগ্রহের অন্যতম দায়িত্বশীল। তিনি চাঁদা সংগ্রহ করে ইবরাহীম মণ্ডলের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঘোষ সব তথ্য লাভ করে ফিরে গিয়ে মালদহের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ৮ জন চাঁদা সংগ্রহকারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির আবেদন করেন। এদের মধ্যে নাযীর সরদার ও ইবরাহীম মণ্ডল অন্যতম। ডিআইজি পুলিশ রেইলী সতর্কতাবশতঃ নিজে রাজমহলে না গিয়ে নবকেষ্ট ঘোষকে সড়কপথে ইসলামপুরে পাঠিয়ে দেন। যাতে তাঁর (ডিআইজি) উপস্থিতি টের পেয়ে মণ্ডলজী পালাতে না পারেন। ঘোষ এবার এক মুসলমান শিক্ষকের বেশ ধরে টিউশনি তালাশের বাহানায় সেখানে গিয়ে অবস্থান নেন। ঘটনাক্রমে মণ্ডলজীর এক ভাতিজার সাথে ঘোষের দেখা হয়ে যায়। সে ঘোষকে একথা বলে সরাসরি তার চাচার কাছে নিয়ে যায় যে, আমার চাচা যেকোন শিক্ষকের সহযোগিতার জন্য পুরা গ্রামে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। ঘোষের পিছে পিছে দুই পুলিশ

Contents

বাশিন্দা ছিলেন। বিহার প্রদেশের ভাগলপুর কমিশনারীতে রাজমহল অবস্থিত।

ইবরাহীম মণ্ডল অত্যন্ত সাহসী ও মুত্তাক্বী ব্যক্তি ছিলেন। আযীমাবাদের (পাটনা) আলেমগণের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সীমান্ত এলাকায় নগদ অর্থও প্রেরণ করতেন এবং জিহাদের জন্য লোকও পাঠাতেন। হান্টার তার Our Indian Musalmans গ্রন্থে যেভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ সরকারের নিকট ইনি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লিখছেন যে, ১৮৭০ সালে যখন ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলোর উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তখন ইবরাহীম মণ্ডল ঐ সমস্ত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে বিশেষভাবে ষড়যন্ত্র মামলার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। হান্টার এও বলেছেন যে, 'তার ষড়যন্ত্রের জাল যেকোন দুর্বল সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল'।

১৮৭০ সালের অক্টোবরে ইবরাহীম মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসন ও সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণের সাজা হয়েছিল।[১০] মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী- যিনি সেই দিনগুলিতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন, তিনি নিজ গ্রন্থ 'কালাপানি'তে লিখছেন- 'একজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি ইবরাহীম মণ্ডলকে ইসলামপুরে গ্রেফতার করে এবং নিজেদের সাধারণ ও পুরনো সাক্ষীদের দ্বারা ইচ্ছামতো সাক্ষী প্রদান করিয়ে বেচারাকে কালাপানিতে রওয়ানা করে দেয়'।

৫. আযীমাবাদের ২য় বিদ্রোহ মামলা :

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের প্রথম মামলা ১৮৬৫ সালে আযীমাবাদে (পাটনা) দায়ের করা হয়েছিল। এর ছয় বছর পর ১৮৭১ সালে ২য় মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় আসামী ছিলেন ৭ জন। এদের নাম হল- ১. মাওলানা মুবারক আলী ২. মাওলানা তাবারুক আলী ৩. হাজী দ্বীন মুহাম্মাদ ৪. হাজী আমীনুদ্দীন ৫. পীর মুহাম্মাদ ৬. হাশমত দাদ খান ও ৭. আমীর খান।[১১]

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বারবুরের আদালতে ১৮৭১ সালের ১লা মার্চে মামলার প্রাথমিক শুনানি শুরু হয়। ২৭শে মার্চে চার্জশিট প্রদান করে অপরাধীদেরকে সেশন জজ আদালতে সোপর্দ করে দেয়া হয়। ১৮৭১ সালের ১লা মে থেকে সেশন জজ মিঃ প্রিন্সপ মামলার শুনানি শুরু করেন। সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ১৩৬ জন সাক্ষীর দীর্ঘ তালিকা আদালতকে প্রদান করা হয়। কিন্তু ১১৩ জনকে আদালতে হাযির করা হয়। ৪৬ জন ব্যক্তি আসামীদের পক্ষ থেকে ছাফাই সাক্ষ্য প্রদান করেন। মাঝখানে কিছুদিন শুনানি মুলতবী থাকে। অতঃপর ১৮৭১ সালের শেষের দিকে মামলার রায় শোনানো হয়। এটি ঈসায়ী ঊনবিংশ শতক ও হিজরী ত্রয়োদশ শতকের শেষ বড় ষড়যন্ত্র মামলা ছিল। যেটি 'বড় ওহাবী মোকদ্দমা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র গ্রেফতারির পর এই মামলার আসামী মাওলানা মুবারক আলীকে ছাদেকপুরের মুজাহিদ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইনি প্রথমে ১৮৬৮ সালে গ্রেফতার হন। এরপর ১৮৭১ সালের মামলায় ধৃত হন এবং তাঁকে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, কারাগারে থাকা অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মুবারক আলীর ছেলে মাওলানা তাবারুক আলীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, ১৮৬২ সালের যুদ্ধে সীমান্তের আম্বালা নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ যে যুদ্ধ করেছিলেন- ইনি তৎকালীন আমীরে মুজাহিদীন মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সাথে জিহাদে শরীক ছিলেন। তিনি মুজাহিদ

কনস্টেবলও সেখানে যায়। তাদের সহায়তায় ঘোষ মণ্ডলজীকে গ্রেফতার করেন। সহকারী কমিশনার উইলমোট ও তার সহকারী ইবরাহীম মণ্ডলকে গ্রেফতারের ব্যাপারে ঘোষকে সহযোগিতা করার জন্য রাজমহল থেকে হাতিতে আরোহণ করে ইসলামপুর এসেছিলেন। দ্রঃ *হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০২-৩০৪ ।-অনুবাদক*।

১০. ১৮৭২ সালে তিনি কালাপানিতে দ্বীপান্তর হন। ১৮৭৬ সালে সেখান থেকে ফিরে আসেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৯) ।-অনুবাদক*।

১১. বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী আমীর খান ও হাশমত দাদ খান পাটনা শহরের আলমগঞ্জের বাশিন্দা ছিলেন। কলকাতায় এই দুই ভাইয়ের চামড়ার প্রসিদ্ধ আড়ৎ ছিল। সরকার তাদের ব্যাপারে অনেক আগ থেকেই সন্দিহান ছিল। সরকারের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট ছিল যে, যখন আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে (এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী) মুচলেকা দিতে বলা হয়েছিল, তখন তারাই তাদের যামিন হয়েছিলেন। তাছাড়া ইবরাহীম মণ্ডলের নিকট জিহাদের ফাণ্ডের জন্য যে নগদ অর্থ জমা হ'ত সেগুলো আমীর খানের মাধ্যমে আশরাফীতে (স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ) রূপান্তরিত করা হ'ত এবং মুবারক আলীর মাধ্যমে গোপনে সেগুলো সীমান্তের জিহাদ কেন্দ্রে পাঠানো হ'ত। তাই সরকার তাদেরকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ ছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে গ্রেফতার করতে পারছিল না। ১৮৬৯ সালের ১৪ই জুন তাবারুক আলীর শ্বশুর পীর মুহাম্মাদকে গ্রেফতারের পর তাঁর নিকটে আমীর খানের একটি পত্র পাওয়া যায়। সরকার প্রমাণ হাতে পেয়ে ১৮৬৯ সালের ৯ই জুলাই কলকাতা থেকে আমীর খানকে গ্রেফতার করে গয়া জেলে বন্দী করে। অতঃপর দ্রুত আলীপুর (কলকাতা) জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে হাশমত দাদ খানকেও গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় আমীর খানের বয়স ছিল ৭৫ বছর এবং হাশমত দাদ খানের বয়স ছিল ৬৭ বছর। গ্রেফতারের পর তাদের চামড়ার আড়ৎ লুট হয়ে যায়। ১৮৭০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদেরকে গ্রেফতারের কোন কারণ জানানো হয়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলাও রুজু করা হয়নি। ফলে খান ভ্রাতৃদ্বয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, হয় তাদেরকে গ্রেফতারের কারণ জানানো হোক, না হয় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হোক। অতঃপর ১৮৭১ সালের মার্চে পাটনায় তাদের মামলার শুনানি শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলনে আর্থিক সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়। পরে রায়ে হাশমত দাদ খানকে ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা তার বিরুদ্ধে কোন চাক্ষুস সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। তিনি ১৮৭৮ সালের কিছু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। আমীর খান ৯ বছরের বেশী জেল খাটার পর ১৮৭৮ সালের নভেম্বরের শুরুতে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের (Lord Lytton) সুফারিশক্রমে মুক্তি পান এবং তার পরপরই ৮ই নভেম্বর তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দু'জনকেই পাটনাতে দাফন করা হয় (হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০৭, ৩১৭-১৯, ৩২৭-২৮, ৩৩০-৩২; *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৯ ।-অনুবাদক*।

বাহিনীর একটি বাহু পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এই অপরাধে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ কালাপানিতে নির্বাসনের সাজা হয়। ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে মাওলানা আমীরুদ্দীন প্রমুখের সাথে কালাপানি পৌঁছেন। ১০ বছর জেল খাটার পর মুক্তি পান। হাজী দ্বীন মুহাম্মাদ ও পীর মুহাম্মাদকে কয়েকবার গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। এভাবে হাজী আমীনুদ্দীনকেও বারবার গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন মামলায় কয়েকবার ফাঁসানো হয়।

জিহাদ আন্দোলনের কতিপয় সাহায্যকারী :

বালাকোট যুদ্ধের পর পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় নেয় যে, আহলেহাদীছ আলেমগণই কেবল জিহাদ আন্দোলনের প্রকৃত সাহায্যকারী হন এবং এই জামা'আতের সাথে কেবল তাদেরই সম্পর্ক বজায় থাকে। এরাই উপরোল্লিখিত পাঁচটি ওহাবী মামলার নিশানায় পরিণত হন। ঐ সমস্ত মামলার বিস্তারিত বিবরণ তো বহু দীর্ঘ। কিন্তু এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে ইঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এক্ষণে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে মুজাহিদীন জামা'আতের কতিপয় সাহায্যকারীর পরিচয় পেশ করা হচ্ছে :

১. মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীর গভীর মনীষা সমগ্র উপমহাদেশে সুবিদিত ছিল। তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর বহু গ্রন্থপ্রণেতা ছাত্র এবং জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি ১৩২৯ হিজরীর ৯ই রবীউল আউয়াল (১০ই মার্চ ১৯১১ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

২. মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী উপমহাদেশের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তিনি সর্বদা জামা'আতে মুজাহিদীনকে আর্থিক ও ব্যক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এটি চরম ইংরেজ সরকার বিরোধী জামা'আত হওয়ায় এর যে কোন ধরনের সাহায্যকারী ইংরেজদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল। মাওলানাও সর্বদা তাদের ক্রোধের পাত্র ছিলেন। তিনি ১৩৩৬ হিজরীর ৪ঠা জুমাদাল আখেরাহ (১৭ই মার্চ ১৯১৮ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

৩. কাযী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানছূরপুরী পূর্ব পাঞ্জাবের সাবেক শিখ রাজ্য পাতিয়ালার সেশন জজ ছিলেন। এটা ছিল অনেক বড় পদ যাতে তিনি সমাসীন ছিলেন। তিনি গোপনে জামা'আতে মুজাহিদীনকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। তিনি ১৩৪৯ হিজরীর ১লা মুহাররমে (৩০শে মে ১৯৩০) মৃত্যুবরণ করেন।

৪. মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী বিদ্যাবত্তা ও রাজনৈতিক দিক থেকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ও তাঁর পুত্ররা সর্বদা জামা'আতে মুজাহিদীনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৩৬১ হিজরীর ৬ই যিলক্বদ (১৬ই নভেম্বর ১৯৪২ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন আহমাদ ক্বাছূরী আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রসিদ্ধ আলেম ও মাওলানা আব্দুল কাদের কাছূরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। তিন বছর জলন্ধর যেলার দাসূহা নামক স্থানে তাঁকে নযরবন্দী করে রেখেছিল। উপমহাদেশকে ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাধীন করানো এবং জামা'আতে মুজাহিদীনকে সহযোগিতা করাই ছিল তাঁর অপরাধ। তাঁর মৃত্যু তারিখ ২৬শে যিলক্বদ ১৩৯০ হিজরী (২৪শে জানুয়ারী ১৯৭১ খ্রিঃ)।

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী এম.এ ক্যান্টবও মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরীর প্রিয়পুত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং এই জামা'আতের বেহিসাব আর্থিক সহযোগিতাও করেন। তিনি ১৩৭৫ হিজরীর ২৬শে জুমাদাল উলা (১২ই জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবী মাদানী পাঞ্জাবের অনেক বড় আলেম পরিবারের খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। জামা'আতে মুজাহিদীনের বিশিষ্ট সাহায্যকারীদের মধ্যে তাঁকে গণনা করা হ'ত। তিনি ১৩৯৩ হিজরীর ২৩শে যিলক্বদ (১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ খ্রিঃ) এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরস্থায়ী জগতে পাড়ি জমান। তিনি 'বাক্বী' (মদীনা মুনাউওয়ারাহ) কবরস্থানে দাফন হন।[১২]

৮. মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ গযনভী উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারের খ্যাতিমান সদস্য ছিলেন। লাহোরের চীনাওয়ালী জামে মসজিদের খত্বীব ছিলেন। জামা'আতে মুজাহিদীনকে সহযোগিতা করার কারণে তাঁকে ইংরেজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকত। তিনি ১৩৪৯ হিজরীতে (১৯৩০ খ্রিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

৯. হাফেয আব্দুস সাত্তার ওমরপুরী ১৩০১ হিজরীতে (১৮৮৪ খ্রিঃ) ওমরপুর (যেলা মুযাফফর নগর, ইউপি) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান-এর পিতা ছিলেন এবং জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। ইংরেজ পুলিশ তাঁর পিছনে লেগে থাকত। সর্বশেষ ১৩৩৪ হিজরীর ১লা জুমাদাল উলা (৬ই মার্চ ১৯১৬ খ্রিঃ) সন্ধ্যায় গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছে, তখন ঐ দিন সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁকে দাফনও করা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন!

এগুলি হল কতিপয় ব্যক্তির নাম। নতুবা অসংখ্য ব্যক্তি ছিলেন যারা যথারীতি মুজাহিদগণের কেন্দ্রে বড় অংকের অর্থ পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে আয়নুল কুযাত লাক্ষ্ণৌভী, মাওলানা যায়নুল আবেদীন (ঢাকা),[১৩] ডাঃ মুহাম্মাদ ফরীদ (দারভাঙ্গা),

---

১২. মাননীয় লেখক এখানে জান্নাতুল বাক্বী লিখেছেন। এটি মারাত্মক ভুল এবং ভ্রান্ত ফের্কা শী'আদের অনুকরণ মাত্র।-*অনুবাদক*।

১৩. এক্ষেত্রে ঢাকার বংশাল নিবাসী হাজী বদরুদ্দীন ওরফে বট্টু হাজীর কথাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ *হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৭৪; মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, মর্দে মুজাহিদ হাজী বদরুদ্দীন (ময়মনসিংহ : ১৯৭২), পৃঃ ২১-২২।-অনুবাদক*।

শায়খ আতাউর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা, রহমানিয়া মাদরাসা, দিল্লী; হাফেয হামীদুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বেনারসী, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, কাযী আব্দুর রহীম (গুজরানওয়ালা), মাওলানা আব্দুল খাবীর আযীমাবাদী, হাকীম নূরুদ্দীন লায়ালপুরী, শেঠ মুহাম্মাদ দাউদ দেহলভী, হাজী আতাউল্লাহ উডানওয়ালা (যেলা ফায়ছালাবাদ) ও অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তি শামিল আছেন। না প্রত্যেকের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব, আর না তাদের পরিচয় পেশ করা সম্ভব।

আরো কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব :

উল্লিখিত বুযুর্গানে দ্বীন ছাড়াও আরো অনেক বুযুর্গ ছিলেন যারা স্থায়ীভাবে মুজাহিদগণের কেন্দ্রকে নিজেদের আবাসস্থল নির্ধারণ করেছিলেন এবং এই সঠিক পথে নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন ছূফী অলি মুহাম্মাদ (ফাতূহীওয়ালা, যেলা ক্বাছূর)। এই পবিত্র দলেরই একজন সদস্য ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর। ১৩৫৩ হিজরীর রামাযান মাসের প্রথম রাত্রে যাকে আব্দুল হালীম নামের এক ব্যক্তি মুজাহিদীন কেন্দ্র চামারকান্দে শহীদ করে দিয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর মূলতঃ ফীরোযপুর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) 'মালওয়া' নামক গ্রামের বাশিন্দা ছিলেন। তিনি ১৩০২ হিজরীতে (১৮৮৫ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। ১৩৩৩ হিজরীতে (১৯১৫ খ্রিঃ) মুজাহিদগণের কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন। অত্যন্ত বাস্তববাদী ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। জামা'আতে মুজাহিদীনই তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[১৪]

জামা'আতে মুজাহিদীনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী। তিনি ১২৯৯ হিজরীর ২৭শে রামাযান (১২ই আগস্ট ১৮৮২ খ্রিঃ) ওয়াযীরাবাদে (যেলা গুজরানওয়ালা) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে রেলওয়ে আদালতে চাকুরীতে নিয়োজিত হন। কিন্তু দ্রুত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ১৯০৩ সালে আসমাস্ত পৌঁছে যান। যেটি সে সময় মুজাহিদগণের কেন্দ্র ছিল এবং মাওলানা আব্দুল করীম ছিলেন জামা'আতের আমীর। জিহাদ আন্দোলনে তিনি অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কয়েকবার গ্রেফতার করে এবং জীবনের অনেকটা সময় তিনি জেলে বন্দী থাকেন। কেন্দ্রীয় আমীরের পক্ষ থেকে তাঁকে ভারতে মুজাহিদীন জামা'আতের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। গোপনে তিনি সমগ্রদেশে ঘুরতেন এবং জামা'আতের কর্মসূচী অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাতেন। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করেছিল। ৩০২ ধারা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি ব্রিটিশ সরকারের দায়ের করা মামলাসমূহে ভুগতে থাকেন। এভাবে বছরের পর বছর আত্মগোপন ও দেশান্তরের পর যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতার ৮ মাস অতিবাহিত হয়েছিল, তখন ১৩৬৭ হিজরীর ১৭ই জুমাদাল আখেরাহ (২৭শে এপ্রিল ১৯৪৮ খ্রিঃ) তিনি নিজ জন্মভূমি ওয়াযীরাবাদে আসলে ব্রিটিশ আমলের দায়ের করা মামলাসমূহের আলোকে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। এজন্য লোকজন পাকিস্তান সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং গভর্ণর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১৩৭০ হিজরীর ২৯শে রজব (৫ই মে ১৯৫১ খ্রিঃ) ওয়াযীরাবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী তাঁকে বালাকোটে দাফন করা হয়।[১৫]

জামা'আতে মুজাহিদীনের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সদস্যগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন ছূফী আব্দুল্লাহ। যিনি ১৩০৪ হিজরীর (১৮৮৭ খ্রিঃ) দিকে ওয়াযীরাবাদে (যেলা গুজরানওয়ালা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন নানাভাবে অতিক্রান্ত হয় এবং কাছাকাছি ১৩২০ হিজরীতে (১৯০২ খ্রিঃ) তিনি জামা'আতে মুজাহিদীনে যোগদান করেন। অতঃপর দ্রুত মুজাহিদগণের কেন্দ্রে চলে যান। তিনি এই জামা'আতের অপরিসীম খিদমত করেন এবং এই পথে কঠিন কষ্ট সমূহ স্বীকার করেন। পুরা যৌবনকাল এ পথে ব্যয় করে দেন। ১৩৪১ হিজরীর (১৯২৩ খ্রিঃ) আগেপিছে উডানওয়ালায় (যেলা ফায়ছালাবাদ) আসেন এবং সেখানে 'দারুল উলূম তা'লীমুল ইসলাম' নামে মাদরাসা চালু করেন। অসংখ্য ছাত্র ও আলেম এই দারুল উলূম থেকে ইলম হাছিল করেছেন। এরপর উডানওয়ালা থেকে তিন মাইল দূরত্বে মামূঁকাঞ্জনে 'জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জামে'আটি কয়েক একর জমিতে অবস্থিত।

ছূফী আব্দুল্লাহ এমন আলেম ছিলেন যার দো'আ কবুল হত। তাঁর দো'আ কবুলের ঘটনাসমূহ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আমি 'তাযকেরায়ে ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ' নামে তাঁর পৃথক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছি। যেটি সাড়ে চারশ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং মাকতাবা সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, লাহোর সেটি প্রকাশ করেছে। তিনি ১৩৯৫ হিজরীর ১৪ই রবীউল আখের (২৮শে এপ্রিল ১৯৭৫) মৃত্যুবরণ করেন এবং জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম (মামূঁকাঞ্জন)-এর সীমানার মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়।

জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাথে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এ জামা'আতের আমীর মাওলানা আব্দুল করীমের সাথে মাওলানা আযাদের যোগাযোগ থাকত এবং জামা'আতের বিভিন্ন সদস্যও গোপনে

১৪. তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১০-১১।-*অনুবাদক*।

১৫. বর্তমানে বালাকোটে সাইয়িদ আহমাদ শহীদের কবরের পাশেই তাঁর কবর রয়েছে। দ্রঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১২; আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'বালাকোটের রণাঙ্গনে', আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৪, পৃঃ ৩৫ ।-অনুবাদক।*

মাওলানার সাথে সম্পর্ক রাখত। আমীর ছাহেবের অনুরোধে একবার মাওলানা আযাদ তাঁর চিকিৎসার জন্য এক তরুণ ডাক্তারও সেখানে (মুজাহিদ কেন্দ্রে) প্রেরণ করেছিলেন। যিনি মাওলানার সম আক্বীদার লোক ছিলেন। এই ডাক্তার কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

এই হল জামা'আতে মুজাহিদীন ও এর কতিপয় সাহায্যকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এসকল ব্যক্তি আহলেহাদীছ মাসলাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের কবল থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করা।

জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা :

এছাড়া উপমহাদেশে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোতেও আহলেহাদীছ আম জনতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বরং কোন কোন সংগঠন আহলেহাদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যেমন ১৯১৯ সালের শেষের দিকে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রচেষ্টায় 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রথম সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। যা ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীমহলীর সভাপতিত্বে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি লিখিত স্বাগত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। অতঃপর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রস্তাব ও প্রচেষ্টায় মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভীকে জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি এবং মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভীকে সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়েছিল।[১৬] ঐ সময় দেশের সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ছিল। মতিলাল নেহরুর

১৬. ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯১৪-১৯১৮) মিন্টু মরলে (Minto Morley) ভারতীয়দের জন্য একটি স্কীম নিয়ে ভারতে আসেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি 'মিন্টু মরলে স্কীম' নামে পরিচিত। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীমহলীর উৎসাহে লাক্ষ্ণৌতে ওলামায়ে কেরামের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানদের কিছু ধর্মীয় বিষয় বিবেচনার জন্য আলেমগণের একটি প্রতিনিধি দল মিন্টু মরলের সাথে দেখা করবে মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হয়। লাক্ষ্ণৌর সেই সম্মেলনে প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, ফাতিহে কাদিয়ান ও শেরে পাঞ্জাব খ্যাত মুনাযির মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামের আলোকে জনসাধারণকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আলেমগণের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উক্ত সম্মেলনে পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দু'দিন পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়াই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। তথাপি মাওলানা অমৃতসরী নিরাশ না হয়ে বিভিন্ন জালসা ও সম্মেলনে এবং সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় এ ধরনের অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপরে আলোকপাত করতে থাকেন। অতঃপর ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তাঁর প্রচেষ্টায় দিল্লীতে একটি তাবলীগী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সুযোগে তিনি লাক্ষ্ণৌ সম্মেলনে পেশ করা প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন। অনেক আলেম তাঁর এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে অমৃতসরে খেলাফত মজলিস ও মুসলিম লীগের সম্মেলন ছিল। এতে খেলাফত ও তুরস্কের বিষয়ে আলোচনার জন্য দেশের অনেক প্রথিতযশা আলেমের অংশগ্রহণের আশা করা হচ্ছিল। এ উপলক্ষে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মাওলানা সাইয়িদ দাউদ গযনভী আলেমগণকে অমৃতসরে আসার দাওয়াত দেন। যাতে এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। দিল্লী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর অমৃতসরে ভারতবর্ষের আলেমগণের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়। এতে দেশবরেণ্য ৫২ জন আলেম অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে সর্বভারতীয় আলেমগণের সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সম্মেলনে মাওলানা অমৃতসরী মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ দেহলভীকে সভাপতি এবং মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভীকে সেক্রেটারী করার প্রস্তাব দিলে মাওলানা সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ তাতে সমর্থন দেন। এই সম্মেলনে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠিত হয়। হাকীম মুহাম্মাদ আজমাল খাঁ সংগঠনের নীতিমালার খসড়া তৈরীর জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ ও মাওলানা খায়রুযযামানের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নীতিমালা তৈরী করে ১লা জানুয়ারী ১৯২০ইং তারিখে পেশ করলে তা গৃহীত হয়। এ অধিবেশনে মাল্টা দ্বীপে বন্দী মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর মুক্তির বিষয়ে প্রথম রেজুলেশন পাশ হয়েছিল। মাওলানার মুক্তির দাবীতে ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। এর খরচ বহন করেছিলেন মাওলানা অমৃতসরী। ১৯২০ সালের ১৯-২১শে নভেম্বর দিল্লীতে মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর সভাপতিত্বে জমঈয়তের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে পাঁচ শতাধিক আলেম অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাব পেশ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং তা ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়া পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, সাইয়িদ মুহাম্মাদ ফাখের এলাহাবাদী, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা সাইয়িদ দাউদ গযনভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী, মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী, মাওলানা আব্দুল গাফফার গযনভী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, মাওলানা আব্দুল হক অমৃতসরী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী, মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী প্রমুখ খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেমগণ এ সংগঠনের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। দেশ বিভাগের পর সত্তুর দশকে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভীর সভাপতিত্ব পর্যন্ত তিনি সহ মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ রায, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী প্রমুখ আহলেহাদীছ আলেমগণ সংগঠনের নেতা ছিলেন। মাওলানা আরাভী একই সাথে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' ও জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। মাওলানা ফারে কালীত ও মুহাম্মাদ সোলায়মান ছাবির বছরের পর বছর জমঈয়তের মুখপত্র 'আল-মাঈয়াহ' (المعية) পত্রিকায় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নিদ্রামগ্ন মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করেছেন। মূলতঃ আহলেহাদীছ ও হানাফী উভয় ঘরানার আলেমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অথচ পরে হানাফী আলেমগণ এটাকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী, 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ কী তাসীস মেঁ ওলামায়ে আহলেহাদীছ কা বুনিয়াদী কিরদার', মাসিক 'মুহাদ্দিছ' (উর্দূ), জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ২৬/৬ সংখ্যা, জুন ২০০৮, পৃঃ ২১-২৫; হাকীম মাহমূদ আহমাদ, ওলামায়ে দেওবন্দ কা মাযী (লাহোর : ইদারা নাশরুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ, ২০০৩), পৃঃ ২৯-৩০; মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদিম সোহদারাভী, সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিতনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৭০-৭২*) ।-অনুবাদক।

সভাপতিত্বে অমৃতসরেই কংগ্রেসের সম্মেলন হয়েছিল। ঐ প্যাণ্ডেলেই মাওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে 'অল ইন্ডিয়া খেলাফত মজলিস'-এর এবং সেখানেই হাকীম মুহাম্মাদ আজমাল খাঁর সভাপতিত্বে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এবং তিনি লিখিত স্বাগত ভাষণ পেশ করেছিলেন।

মজলিসে আহরার প্রতিষ্ঠা :

১৯২৯ সালে 'মজলিসে আহরার' প্রতিষ্ঠা লাভ করলে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁকে এর সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়।

মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী ১৯২০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। খেলাফত মজলিসের সভাপতিত্বও কয়েক বছর তাঁর ওপরে ন্যস্ত ছিল।

মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী (মৃঃ ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রিঃ/৩রা ছফর ১৩৬৯ হিঃ) দেশের স্বাধীনতার জন্য অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলসমূহে অন্তর্ভুক্ত হন এবং জেল-যুলুমের কষ্ট সহ্য করেন। তিনি জামা'আতে মুজাহিদীন-এরও অনেক বড় সাহায্যকারী ছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও মানুষ অবগত আছে। 'তাহরীকে রেশমী রুমাল' বা 'রেশমী রুমাল আন্দোলনে'ও এঁরা শামিল ছিলেন।[১৭] এ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে বহু আহলেহাদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দের নাম লিখিত আছে। সীমান্ত প্রদেশের 'খোদায়ী খিদমতগার জামা'আতে'ও অসংখ্য আহলেহাদীছ সক্রিয় ছিলেন এবং কারাবন্দী হয়েছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। অতএব এখানেই এ বিষয়ে আলোচনার ইতি টানছি। শুধু এটা উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য যে, উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আহলেহাদীছ জামা'আত সর্বদা সক্রিয় ভূমিকায় ছিল।

---

১৭. ১৯১৪ সালের পর মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী এ আন্দোলন শুরু করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। যদিও ব্রিটিশ নথিপত্রে এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাওলানা মাহমূদুল হাসানকে তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও তাদের কর্মী বলা হয়েছে। কিন্তু দেওবন্দীরা তাঁকেই এর প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকে। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা যেই হোক না কেন এতে দেওবন্দের সকল আলেমের নিরঙ্কুশ সমর্থন ছিল না। কারণ মাওলানা মাহমূদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা আযীয গুল ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছাড়া অন্য কোন দেওবন্দী আলেমের নাম ব্রিটিশ নথিতে পাওয়া যায় না। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হচ্ছে- ১ম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠলে ভারতের সেনা ছাউনীগুলো একেবারে খালি হয়ে যায়। ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সৈন্যদেরকে ইরাক, ফিলিস্তীন, সাইপ্রাস ও আশপাশের দেশগুলোতে তুর্কীদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সুযোগে চামারকান্দের মুজাহিদ নেতারা বিশেষতঃ মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর লাহোরী জার্মান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে কাবুলে তাদের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের অনুরোধ জানায়। যাতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোন কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়। কাবুলে জার্মান মিশন ব্যর্থ হলেও সেখানে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সদস্যবৃন্দ হিন্দুস্তানের বড় বড় রাজ্যের রাজা ও নওয়াবদের কাছে জার্মান রাষ্ট্রদূতের চিঠি পৌঁছিয়ে দিবেন। যাতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানী বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারতে আক্রমণ করলে এখানকার রাজা ও নওয়াবরা বেঁকে না বসেন। এ চিঠিগুলো রেশমী রুমালে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এ আন্দোলনের নাম হয়েছিল 'তাহরীকে রেশমী রুমাল'। মূলতঃ এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশকে এদেশ থেকে উৎখাতের জন্য উছমানীয় তুর্কী খলীফা, জার্মানী ও আফগানিস্তানের নিকট থেকে সাহায্য লাভ করা। একটি জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল এর লক্ষ্য। এজন্য এতে শিখ ও হিন্দুরাও শামিল ছিল। সেকারণ একে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলা যায় না। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হওয়ার কারণে এতে বহু আহলেহাদীছ অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, মৌলভী আব্দুল হক, মাওলানা আব্দুল করীম (জিহাদ আন্দোলনের আমীর), আব্দুল খালেক, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, আব্দুল্লাহ শেখ (শিয়ালকোট), আব্দুল লতীফ, আব্দুল মজীদ, মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুস সালাম ফারূকী (দিল্লীর প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ প্রেস ফারূকী-এর মালিক), মাওলানা আব্দুর রহীম (লাহোরের চীনাওয়ালী জামে মসজিদের সাবেক ইমাম), মৌলভী আব্দুর রহীম আযীমাবাদী, মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী, মাওলানা মহিউদ্দীন কাছূরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাছূরী, মুহাম্মাদ আসলাম, মুহাম্মাদ এলাহী (ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদীর ভাই), নাযীর আহমাদ কাতিব, রশীদুল্লাহ (ঝাণ্ডার পীর), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মৌলভী অলি মুহাম্মাদ ফাতূহীওয়ালা ওরফে মৌলভী মূসা, নওয়াব যমীরুদ্দীন আহমাদ-এর নাম ব্রিটিশ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে *(হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাহরীকে জিহাদ : জামা'আতে আহলেহাদীছ আওর ওলামায়ে আহনাফ (গুজরানওয়ালা-পাকিস্তান : নাদওয়াতুল মুহাদ্দিছীন, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খ্রিঃ), পৃঃ ৭৮-৮০)*। পূর্ণ বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও দূরদর্শিতার সাথে আহলেহাদীছ আলেম ছূফী আব্দুল্লাহ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৭টি চিঠি নেপাল, জয়পুর, যোধপুর-এর মহারাজা এবং গোয়ালিয়র, অন্ধ্রপ্রদেশ-এর রাজা ও ভাওয়ালপুরের নওয়াবের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। ১টি চিঠি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও শওকত আলীর (আলী ভ্রাতৃদ্বয়) নিকট পৌঁছিয়ে তাঁদেরকে সেটি রামপুরের নওয়াবের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে মাত্র একটি চিঠি প্রদান করা হয়েছিল মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে। তিনি সেটি নওমুসলিম আব্দুল হকের হাতে দিয়ে মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা বলেন। যাতে তিনি পত্রটি মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু মুলতান ছাউনী স্টেশনে খান বাহাদুর রব নওয়ায খান তাঁর নিকট থেকে চিঠিটি হস্তগত করে পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ওডওয়ার (Michael Oddware)-কে দিয়ে দেন। ফলে সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর শিষ্য ক্যাপ্টেন যাফর আহসান স্বীয় আত্মজীবনী 'আপবীতী'-এ উল্লেখ করেছেন যে, 'এ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ আব্দুল হক পুলিশে চাকরি পায় আর খান বাহাদুর রব নওয়ায পান নগদ অর্থ'। তিনি এটাও বলেছেন যে, 'আব্দুল হক আমাদের নিকট গোয়েন্দা হিসাবে এসেছিল' *(ওলামায়ে দেওবন্দ কা মাযী, পৃঃ ২৪৬-২৪৭)*। ব্রিটিশ নথিতে ১৩ জন বিশ্বাসঘাতকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যারা ইংরেজ সিআইডির নিকট তথ্য ফাঁস করে এ আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি মাওলানা মাহমূদুল হাসানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও তাঁর হিজায সফরের সময় তাঁর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীও ইংরেজদের জিজ্ঞাসাবাদে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। দেওবন্দী আলেমগণের কারণেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। দেওবন্দী আলেমগণ একে তাদের একক কৃতিত্ব বলে দাবী করেন, যা প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করার শামিল *(মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আসলাম সায়েফ ফীরোযপুরী, তাহরীকে আহলেহাদীছ তারীখ কে আয়েনে মেঁ (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়া, ২০০৫), পৃঃ ২৮৪-২৮৭; তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৭৩-৮৪; Maulana Muhammad Miyan, Silken Letters Movement, Translated by: Muhammadullah Qasemi (Deoband : Shaikhul Hind Academy, 2012) p. 49.) -অনুবাদক*।

মুনাফিকী

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা সমগ্র সৃষ্টির মালিক মহান আল্লাহ্‌র। অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর ছাহাবীগণের উপর।

মুনাফিকী একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মানুষের মনকে কলুষিত করার যত রকম ব্যাধি আছে তন্মধ্যে মুনাফিকী অন্যতম বড় ব্যাধি। মানুষ স্বেচ্ছায় মুনাফিক হয়ে যায় না, বরং তার অজান্তেই এ ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ আমলী (কর্মগত) নিফাকের বেলায় একথা খুবই প্রযোজ্য। এর মানে এই নয় যে, মানুষ এর মুকাবিলা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এবং নিজেকে এথেকে রক্ষা না করে যে এ বিষয়টাকে হেয় জ্ঞান করে তার ভুল ধরবে। কেননা মুনাফিকী মানুষের সব সৎ ও ভাল গুণ ছিনিয়ে নেয়। তাকে সৎ আমল সমূহ থেকে বঞ্চিত করে এবং উন্নত মূল্যবোধগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এক পর্যায়ে তাকে সমাজে পরিত্যক্ত পরাভূত মানুষে পরিণত করে। এজন্যই কুরআন মাজীদের একাধিক সূরায় মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচিত করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

এই গ্রন্থে আমরা মুনাফিকীর পরিচয়, প্রকারভেদ, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তা থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে আলোচনা করব। এই গ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশের প্রতিটি স্তরে যারা যারা অংশ নিয়েছেন, আমি তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আল্লাহ যেন অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর।

মুনাফিকীর পরিচয়

আভিধানিক অর্থে :

আরবী ভাষায় ن (নূন), ف (ফা) ও ق (ক্বাফ) বর্ণ তিনটি দ্বারা গঠিত শব্দের দু'টি উচ্চারণ রয়েছে- نَفَقَ ও نَفِقَ তন্মধ্যে একটির অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিদূরিত হওয়া এবং অন্যটির অর্থ কোন জিনিস গোপন করা, উপেক্ষা করা। শব্দটি اَلنَّفَقُ থেকে নির্গত। এ শব্দটির অর্থ মাটির মধ্যস্থিত গর্ত বা সুড়ঙ্গ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায়। মুনাফিককে এজন্য মুনাফিক বলা হয়েছে যে, মুনাফিক তার কুফরী বিশ্বাসকে মনের মাঝে লুকিয়ে রাখে।[১৮] যদিও মুনাফিকীর বিষয়টি আরবী ভাষায় সুবিদিত। তবুও আরবরা শব্দটিকে কোন বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করেনি।

শরী'আতের পরিভাষায় মুনাফিকী :

ভালকে প্রকাশ করা এবং মন্দকে গোপন রাখার নাম মুনাফিকী। ইবনু জুরাইজ বলেছেন, মুনাফিক সেই যার কথা তার কাজের, গোপনীয়তা প্রকাশ্যতার, ভেতর বাহিরের এবং বাহ্যিকতা অদৃশ্যমানতার বিপরীত।[১৯]

মুনাফিকীর প্রকারভেদ :

মুনাফিকী বড় ও ছোট এই দু'ভাগে বিভক্ত। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, 'কুফরের মতই মুনাফিকীর স্তর ভেদ আছে। এজন্য অনেক সময় বলা হয়, এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে না। অনুরূপ বড় মুনাফিকী (نفاق أكبر) ও ছোট মুনাফিকী (نفاق أصغر)।[২০]

১. বিশ্বাসগত মুনাফিকী (বড় মুনাফিকী) : যে মুনাফিক বাইরে নিজের ঈমান ও ইসলাম যাহির করে কিন্তু নিজের মনের মাঝে কুফরী লালন করে, সে আক্বীদাগত মুনাফিক। এ ধরনের মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল। এদেরই নিন্দায় কুরআন নাযিল হয়েছে এবং এদেরকে কুরআন কাফির বলেও ঘোষণা দিয়েছে। কুরআনের বার্তা অনুযায়ী এরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে বসবাস করবে। ইবনু রজব বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী, তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি ঈমানের কথা যে মুখে প্রকাশ করে কিন্তু এর সবগুলো কিংবা অংশবিশেষকে অন্তরে অবিশ্বাস করে সে বড় মুনাফিক।[২১] ফকীহ বা মুসলিম আইনজ্ঞরা কখনো কখনো মুনাফিক এর স্থলে 'যিনদীক' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'এক শ্রেণীর যিনদীক আছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও রাসূলগণের অনুসরণের কথা প্রকাশ করে এবং মনের মাঝে কুফর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে শত্রুতা লুকিয়ে রাখে। এরাই মূলতঃ মুনাফিক এবং এদেরই আবাসস্থল হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে'।[২২]

২. আমল বা কর্মগত মুনাফিকী (ছোট মুনাফিকী) :

ধর্মীয় কাজগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়মমাফিক পালন না করা, তবে জনসমক্ষে সেগুলো যথাযথ পালন করার নাম আমল বা কর্মগত মুনাফিকী। এক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও অন্যান্য আক্বীদা-বিশ্বাসে কোন ঘাটতি থাকবে না।

---

* *কামিল, এমএ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১৮. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১০/৩৫৭; ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৪৫৫।

** *[বাংলা ভাষায় 'মুনাফিক' শব্দটির অর্থ কপট, ভণ্ড, দ্বিমুখী নীতি বিশিষ্ট, শঠ, প্রবঞ্চক, সত্য গোপনকারী ইত্যাদি এবং মুনাফিকী অর্থ প্রতারণা, শঠতা, কপটাচার, ভণ্ডামি ইত্যাদি (বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃঃ ৯৯২)।-অনুবাদক]*

১৯. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১/১৭৬।

২০. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ৭/৫২৪।

২১. ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

২২. ইবনুল কাইয়িম, তরীকুল হিজরাতায়ন, পৃঃ ৫৯৫।

ইবনু রজব বলেছেন, ছোট মুনাফিকী হ'ল আমলে মুনাফিকী। যখন মানুষ প্রকাশ্যে নেক আমল করে কিন্তু অপ্রকাশ্যে তার উল্টো কাজ করে তখন তা ছোট মুনাফিকী বলে গণ্য হয়।[২৩]

আমলকেন্দ্রিক এই ছোট মুনাফিকী মূল ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও মুসলিমের মনে বাসা বাধতে পারে। যদিও সেটা কবীরা বা বড় গুনাহ। কিন্তু বড় মুনাফিকী সর্বতোভাবে ঈমানের পরিপন্থী। তা কোনভাবেই একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের সাথে যুক্ত হ'তে পারে না। তবে ছোট মুনাফিকী যখন অন্তরে শিকড় গেড়ে বসে এবং পূর্ণতা লাভ করে, তখন সময় বিশেষে তা ঐ মুনাফিককে বড় মুনাফিকীর দিকে ধাবিত করে এবং দ্বীন থেকে একেবারে খারিজ করে দেয়।

আমলগত মুনাফিক জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে না। সে বরং অন্য সকল কবীরা গুনাহগারদের কাতারভুক্ত। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, আর চাইলে তার পাপের কারণে শাস্তি দিয়ে পরিশেষে জান্নাতের অধিবাসী করবেন।

মৌলিক ও অমৌলিক মুনাফিকী :

যে লোক আদি থেকেই কোনদিন ছহীহ-শুদ্ধ, খাঁটি ইসলামে বিশ্বাসী নয় মূলতঃ সেই মূল থেকে মুনাফিক। জাগতিক কোন স্বার্থের টানে এমন লোকেরা ইসলামের সঙ্গে সম্বন্ধ যাহির করে বটে, অথচ তারা মন থেকে ইসলামকে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা তাদের ইসলাম ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই মুনাফিক। তারপর সেই মুনাফিকীর উপর তারা চলছেই। এটা মৌলিক মুনাফিকী। আবার কিছু লোক আছে যারা সত্যসত্যই অন্তর থেকে ইসলামের ঘোষণা দেয়। তারপর এক সময় তাদের মনে সন্দেহ ও শঠতা জাগে। অতঃপর বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের সত্যতার পরীক্ষা নেন। তখন তারা ইসলামের দাবী রক্ষা করতে না পেরে ভেতর থেকে ইসলাম ছেড়ে দেয় বা মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলে তাদের উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হ'তে পারে কিংবা মুসলিম নাম বহাল থাকায় জাগতিক যেসব সুযোগ-সুবিধা সে পাচ্ছে তা খোয়াতে হবে, অথবা তাকে নিন্দা শুনতে হবে এবং সমাজে তার যে অবস্থান আছে তা সে হারিয়ে বসবে। এরকম আরো অনেক উপভোগ্য ও লোভনীয় বিষয়ের কথা চিন্তা করে তারা প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে ভয় পায়। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কাফির মুরতাদ হয়ে গেছে। এটাই অমৌলিক মুনাফিকী।

মুনাফিক হয়ে পড়ার ভয় :

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাঁদের পরবর্তী আমলের নেককার লোকেরা মুনাফিকীকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। এমনকি আবুদ্দারদা (রাঃ) ছালাতে তাশাহহুদ শেষে মুনাফিকী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশী বেশী করে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাইতেন। একবার তো এক ব্যক্তি তাঁকে বলেই বসল, হে আবুদ্দারদা! মুনাফিকী নিয়ে আপনি এত বিচলিত বোধ করেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, دعنا عنــــك والله إن الرجــــل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلــــع منــــه. অর্থাৎ আমাদের কথা ছাড়। আল্লাহ্‌র কসম! মানুষ এক মুহূর্তে তার দ্বীন বদলে ফেলতে পারে! তখন তার নিকট থেকে দ্বীন ছিনিয়ে নেয়া হয়।[২৪]

হানযালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, হানযালা কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে (نَافَقَ حَنْظَلَةُ)। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আরে তুমি বলছ কি? আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থাকি আর তিনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা যেন সেগুলো চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে চলে আসি আর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমারও তো এমন অবস্থা হয়। তখন আবুবকর (রাঃ) ও আমি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'লাম। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ), হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটা কীভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি এবং আপনি আমাদের নিকট জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা ওগুলো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। অথচ যখন আপনার নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি তখন তার অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً. 'যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমরা যদি আমার নিকট থাকাকালীন অবস্থায় এবং সর্বদা যিকিররত থাকতে পারতে, তাহ'লে তোমাদের ঘরে-বাইরে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুছাফাহা (করমর্দন) করত। কিন্তু হে হানযালা! সময় সময় অবস্থার হেরফের ঘটে'।[২৫]

---

২৩. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

২৪. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৮২, যাহাবী বলেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।

২৫. মুসলিম হা/২৭৫০।

'হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে' (نافق حنظلة) কথাটির অর্থ তাঁর এ শঙ্কা মনে জাগছে যে, তিনি মুনাফিক। কারণ তিনি যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর মাহফিলে থাকেন তখন তাঁর মনে এক প্রকার ভয় কাজ করে। এর প্রভাব স্বরূপ আখিরাতের প্রতি তাঁর ধ্যান-ধারণা ও মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়ার পর স্ত্রী, সন্তান ও জীবন-জীবিকার মাঝে মশগূল হয়ে পড়লে তাঁর এ ভাবনা অনেকাংশে লঘু হয়ে পড়ে। তাই তাঁর চিন্তা হয়- তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন বলেই এমন হয় কি-না। কিন্তু মুনাফিকী তো মূলত দুরভিসন্ধি মনের মাঝে গোপন রেখে তার উল্টোটা প্রকাশ করা। তাই নবী করীম (ছাঃ) তাঁদের জানিয়ে দিলেন, এরূপ অবস্থা তৈরী হওয়া কোন মুনাফিকী নয় এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর মাহফিলে থাকাকালীন মানসিক অবস্থায় সর্বক্ষণ বিরাজিত থাকার জন্যও তারা বাধ্য নন। 'সময় সময়' অর্থ এক সময়ে অবস্থা উন্নত হ'তে পারে এবং অন্য সময়ে তার অবনতি ঘটতে পারে অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে।[২৬]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি জানাযায় হাযির হওয়ার জন্য ওমর (রাঃ)-কে ডাকা হয়। তিনি তাতে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমি তখন তাঁকে আঁকড়ে ধরে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন!! আপনি বসুন। কেননা এই মৃত লোকটা ওদের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। আমার কথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাকে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি কি তাদের একজন? আমি বললাম, না। অবশ্য আপনার জীবনাবসানের পর আমি আর কাউকে নির্দোষ আখ্যায়িত করব না।[২৭]

ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর ত্রিশজন ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁদের প্রত্যেকেই নিজের মাঝে মুনাফিকী থাকার ভয় করতেন। তাঁরা কেউই বলতেন না, আমার ঈমান জিবরীল ও মিকাঈলের তুল্য।[২৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! এই ছাহাবীদের অন্তর ঈমান ও ইয়াকীনে একদম পরিপূর্ণ ছিল। অথচ তাঁরা কঠিনভাবে মুনাফিকীর ভয় করতেন। মুনাফিকী নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালে এসে অনেককে দেখুন, ঈমান তাদের কণ্ঠদেশও অতিক্রম করেনি অথচ তাদের ঈমান জিবরীল মিকাইলের সমতুল্য বলে তারা দাবী করে।[২৯]

ছাহাবীগণ তাঁদের মুনাফিকী দ্বারা ঈমানের পরিপন্থী যে মুনাফিকী তাকে বুঝাননি। বরং মূল ঈমানের সঙ্গে যে মুনাফিকী যুক্ত হয় তাই বুঝিয়েছেন।[৩০]

কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র :

কুরআন ও সুন্নাহ্র নানা স্থানে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র বা দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে এবং মুমিনদের সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি মুনাফিকদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্বতন্ত্র একটি সূরাই (সূরা মুনাফিকূন) নাযিল করেছেন। নিম্নে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল।

১. ব্যাধিগ্রস্ত মন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فِيْ قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ 'এদের (মুনাফিকদের) মনের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক ব্যাধি। অতঃপর (প্রতারণার কারণে) আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১০)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর খেয়াল-খুশির ব্যাধিগুলো তাদের মনে জেঁকে বসায় তা নষ্ট হয়ে গেছে। আর ভাল ইচ্ছেগুলোর উপর মন্দ ইচ্ছেগুলো জয়যুক্ত হওয়ায় তাদের মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। আর তাদের এহেন নষ্ট অবস্থা তাদেরকে ধ্বংসের কিনারে নিক্ষেপ করেছে। ফলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও এখন তাদের অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা করতে সক্ষম হচ্ছেন না। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, তাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত। ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন'।[৩১]

২. খেয়াল-খুশির প্রলোভন :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ 'আল্লাহকে ভয় করলে তোমরা অন্য পুরুষের সাথে কথা বলার সময় নম্র আওয়াযে কথা বলো না। এমন করলে যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা তোমাদের প্রতি প্রলুব্ধ হবে' *(আহযাব ৩৩/৩২)*। যাদের ঈমান দুর্বল তারা নারীদের (কোমল কথা শ্রবণ করে) প্রতি প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হয়। তাদের ঈমানী দুর্বলতা ইসলামের প্রতি সন্দেহবশতঃ হ'লে তো তারা মুনাফিক। আর এজন্যই মুনাফিকরা আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে লঘু মনে করে। আবার অশ্লীল কাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখানোর জন্যও তাদের ঈমান দুর্বল হ'তে পারে।[৩২]

৩. অহংকার প্রদর্শন :

মুনাফিকরা অহংকারী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُوْنَ 'এদের (মুনাফিকদের)

---

২৬. *নববী, শারহু মুসলিম ১৭/৬৬-৬৭।*
২৭. *ইবনু আবী শায়বা ৮/৬৩৭; আল-হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/৪২ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ (رجاله ثقات)। শু'আইব আরনাউত একে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ মুসনাদ আহমাদ হা/২৬৬৬৩, ৬/৩০৭।*
২৮. *বুখারী ১/২৬।*
২৯. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৮।*
৩০. *ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/১৭২।*

৩১. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৯।*
৩২. *ইবনু জারীর ত্বাবারী, জামিউল বায়ান ২০/২৫৮।*

Contents

যখন বলা হয় তোমরা (আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে) এসো তাহ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা অবজ্ঞাভরে মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি (এও) দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে' *(মুনাফিকূন ৬৩/৫)*।

মুনাফিকদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক। তাদেরকে যখন ডেকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট এসো। তিনি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন অহংকারবশতঃ তারা সে কথা মোটেও গ্রাহ্য করে না বরং সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে মাথা দুলিয়ে চলে যায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন, অহংকার বশে ওদের তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে। পরে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিফল কী দাঁড়াবে তা উল্লেখ করে বলেছেন, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ '(আসলে) তুমি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর কিংবা না কর উভয়ই তাদের জন্য সমান। কারণ আল্লাহ তা'আলা কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কোন ফাসিক জাতিকে হেদায়াত দান করেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/০৬)*।[৩৩]

৪. আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহের সাথে ঠাট্টা-তামাশা :

মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র আয়াত তথা কথা ও বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। তাদের এ আচরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوْا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ 'মুনাফিকরা (সদাই) এ আশংকায় থাকে যে, তাদের বিপক্ষে এমন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় কি-না যাতে তাদের মনের কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। তুমি বল, তোমরা ঠাট্টা-মশকরা করতে থাক। তোমরা যার ভয় করছ, আল্লাহ তা ঠিকই প্রকাশ করে দিবেন' *(তওবা ৯/৬৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের মুনাফিকদের মনে সব সময় এই আশঙ্কা বিরাজ করত যে, কুরআনের কোন সূরা নাযিল হয়ে মুমিনদের নিকট তাদের মনের সকল দূরভিসন্ধি ও জারিজুরি ফাঁস করে দেয় কি-না? কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর এ আয়াত নাযিলের কারণ হ'ল, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দোষারোপ করত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের কাজের সমালোচনা করত। যখন তারা এসব করত তখন বলত, দেখ, আল্লাহ আবার আমাদের গোপন কথা তাঁর নবীর নিকট ফাঁস করে দেন কি-না? ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বললেন, ওদের তুমি ধমকের সুরে ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে বল, ঠিক আছে তোমরা ঠাট্টা-মশকরা চালিয়ে যাও। তোমরা যার ভয় করছ, আল্লাহ তা ঠিকই প্রকাশ করে দিবেন।[৩৪]

৩৩. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/৪৭৩।*
৩৪. *জামিউল বায়ান ১৪/৩৩১।*

৫. মুমিনদের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা :

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ، اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ- 'তারা (মুনাফিকরা) যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তাদের দুষ্ট নেতাদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি। (ঈমানের কথা বলে তাদের সাথে) আমরা কেবলই ঠাট্টা করি। (মূলতঃ) আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন এবং সীমালংঘনজনিত কাজে যাতে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেজন্য তাদের অবকাশ দিয়ে রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪-১৫)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, মুনাফিকরা প্রত্যেকেই দ্বিমুখী আচরণকারী। এক মুখে তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়। অন্য মুখে ভোল পাল্টিয়ে তারা তাদের কাফির ভাইদের সাথে মিলিত হয়। তাদের জিহ্বাও দু'টো। এক জিহ্বা দিয়ে তারা মুসলমানদের সাথে উপর উপর কথা বলে, আর অন্য জিহ্বা তাদের গোপন অবস্থার ভাষ্যকার।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারীদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামশা করা এবং তাদের তুচ্ছ ভাবা ওদের স্বভাব। এ কারণে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের যে বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, তা কেবলই তাদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার বাড়িয়ে তোলে। বিনয়-নম্রতা কী তা তারা বোঝে না? ফলে অহংকার হেতু তারা অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। ফলে প্রিয় পাঠক! আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, তারা অহি-র খোলামেলা সহজবোধ্য বিষয়ের সাথেও ঠাট্টা-তামাশা করতেই থাকে। তাইতো আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন এবং সীমালংঘনজনিত কাজে যাতে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেজন্য তাদের অবকাশ দেন।[৩৫]

৬. মানুষকে আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের জন্য ব্যয়ে বাধা দান:

তাদের এরূপ অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ-

'এই মুনাফিকরা তো সেসব লোক, যারা (আনছারদের) বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের (মুহাজির) সাথীদের জন্য তোমরা কোন রকম অর্থ ব্যয় করো না। (তাহ'লে আর্থিক সংকটের কারণে) তারা রাসূলের কাছ থেকে সরে পড়বে। অথচ আসমান ও যমীনের ধনভাণ্ডার সমূহ তো আল্লাহ্‌র। আসলে মুনাফিকরা কিছুই বুঝতে চায় না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৭)*।

৩৫. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫০।*

যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সে যুদ্ধে আমি আব্দুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফিকদের নেতা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটস্থ মক্কার মুহাজিরদের জন্য তোমরা মদীনাবাসীরা কিছুই খরচ করো না। দেখবে, অর্থকষ্টে পড়ে তারা তাঁর নিকট থেকে সরে পড়বে। মদীনায় ফিরে যেতে পারলে অবশ্যই আমরা সম্মানী লোকেরা সেখানে অবস্থিত ছোট লোকদের (অর্থাৎ মুহাজিরদের) বের করে দেব। আমি এ কথা আমার চাচা অথবা ওমর (রাঃ)-কে বললাম। তিনি কথাটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালে আমি তাঁকে সব বললাম। তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের ডাকিয়ে আনলেন। তারা শপথ করে বলল, এমন কথা তারা বলেইনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন আমাকে মিথ্যুক এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে সত্যবাদী ভাবলেন। ফলে আমি যার পর নেই ব্যথিত হ'লাম। মনোকষ্টে আমি ঘরে বসে থাকলাম। এ অবস্থা দেখে আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে মিথ্যুক মনে করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে কি তুমি মনে করলে? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, إِذَا جَـــاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ 'যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে...। এ সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট লোক পাঠান। তিনি সূরা পড়ে শুনান এবং বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ 'হে যায়েদ! আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন'।[৩৬]

৭. মুমিনদের মূর্খ আখ্যা দেওয়া :

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـــكِنْ لاَّ يَعْلَمُوْنَ 'যখন তাদের (মুনাফিকদের) বলা হয়, লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমন ঈমান আনো, তখন তারা বলে, ঐ নির্বোধরা যেমন ঈমান এনেছে আমাদেরও কি তেমন ঈমান আনতে হবে? সাবধান! ওরাই আসলে নির্বোধ। কিন্তু ওরা তা অনুধাবন করতে পারে না' *(বাক্বারাহ ২/১৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মুনাফিকরা কুরআন ও সুন্নাহর ধারক-বাহকদের প্রান্তিক ও ব্রাত্যজন হিসাবে মনে করে। তাদের ধারণায় এদের বোধ-বুদ্ধি খুবই অল্প। তাদের মতে কুরআন-হাদীছের বাণী বাহকরা সেই গাধাতুল্য যে তার পিঠে বইয়ের বোঝা বহন করে। গাধার চিন্তা থাকে কেবল বোঝা বহন করা। তাই বইয়ের বোঝা বইলেও তো আর গাধাটাকে শিক্ষিত বলা যায় না। অহি-র বেসাতিকারীর পণ্য (অর্থাৎ ইসলামী বিধানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় জীবনপাতকারীর চেষ্টা) মুনাফিকদের দৃষ্টিতে মন্দা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কাছে এ পণ্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তারা মনে করে ইসলামের অনুসারীরা নির্বোধ। ফলে তারা নিজেরা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন মুসলমানদের নষ্ট ও অপয়া হিসাবে তুলে ধরতে তৎপরতা দেখায়'।[৩৭]

৮. কাফেরদের সাথে সম্প্রীতি রাখা :

মুনাফিকদের সখ্যতা ও সম্প্রীতি মুমিনদের সাথে নয় বরং কাফেরদের সাথে লক্ষ্য করা যায়। কাফেরদের সাথে তাদের এই দহরম মহরমের জন্য আল্লাহ বলেছেন, بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً، الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعاً- 'হে নবী! তুমি মুনাফিকদের এই সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ আযাব রয়েছে, যারা (দুনিয়ার ফায়েদার জন্য) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা কি এর দ্বারা এদের কাছ থেকে কোন সম্মান লাভের প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতয়ি সম্মান আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট' *(নিসা ৪/১৩৮-৩৯)*।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে রাসূল! যারা আমার সাথে কুফরী করে এবং আমার দ্বীনের মধ্যে বিরোধিতার পথ বের করে তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে মুমিনদের বাদ দিয়ে তারা মুনাফিক। এই মুনাফিকদের তুমি কঠিন শাস্তি লাভের সুসংবাদ দাও। তারা কি আমার প্রতি যারা ঈমান রাখে তাদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু ও সহযোগিতাকারী রূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের কাছে শক্তি ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করে? কিন্তু সম্মান, শক্তি, সহযোগিতা সবই তো আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত। অতএব তারা কেন মুমিনদের বন্ধু ও সহযোগিতাকারী রূপে গ্রহণ করে না? তা করলে তারা আল্লাহ্র কাছে সম্মান, প্রতিরোধ ও সহযোগিতার আবেদন করতে পারত। যার কাছেই মূলতঃ সব শক্তি ও দাপট জমা রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। এভাবে ঐ মুনাফিকরাও তখন সম্মান ও শক্তির মালিক হ'ত।[৩৮]

৯. মুমিনদের ব্যাপারে প্রতীক্ষা :

[মুনাফিকরা মুসলমানদের ভাল-মন্দের প্রতীক্ষা করে। ভাল কিছু হ'লে বলে, আমরা তো তোমাদেরই লোক। এ কাজে আমাদেরও অংশ আছে। আর খারাপ কিছু হ'লে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সুবিধা আদায় করে।-অনুবাদক]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُوْا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً 'যারা (মুনাফিকরা) তোমাদের অকল্যাণের প্রতীক্ষায়

৩৬. *বুখারী হা/৪৯০০; মুসলিম হা/২৭৭২।*

৩৭. *ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫০।*

৩৮. *জামিউল বায়ান ৯/৩১৯।*

Contents

থাকে। যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা বলে, আমরা কি (এ যুদ্ধে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের ভাগে বিজয়ের অংশ লেখা হয় তখন এরা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে (গোপনে) সহায়তা করিনি এবং তোমাদেরকে মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি? এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা শুনিয়ে দেবেন এবং সেদিন আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের কোন অজুহাত পেশ করার কোন পথই খোলা রাখবেন না' *(নিসা ৪/১৪১)*। বস্তুত মুনাফিকরা মুমিনদের বেলায় অপেক্ষায় থাকে। যদি কোন যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রুপক্ষের উপর বিজয় দান করেন এবং তাতে গণীমতের সম্পদ অর্জিত হয় তখন তারা মুমিনদের নিকট এসে বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে থেকে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিনি? তোমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করিনি? যেহেতু আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি সেহেতু তোমরা গণীমতের একটা অংশ আমাদের দাও। আর যদি মুসলমানদের শত্রুপক্ষ কাফের বাহিনী মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়, তখন মুনাফিকরা কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা কি তোমাদের বিজয়ের পথ করে দেইনি? সেজন্যই তো তোমরা মুমিনদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছ। আমরা তোমাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। ফলে তারা অপদস্থ হয়ে যুদ্ধ বিরতি দিয়েছিল, আর সেই ফাঁকে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছ। এখন এরূপ করলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঠিকই মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে ঠিক ঠিক বিচার করবেন। চূড়ান্ত বিচারে তিনি মুমিনদের জান্নাতে দাখিল করবেন আর মুনাফিকদেরকে তাদের বন্ধু কাফেরদের সাথে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[৩৯]

[চলবে]

কাদেসিয়া যুদ্ধ

*আব্দুর রহীম**

ভূমিকা :

বর্তমান ইরাক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। এখানে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। পশ্চিমা হায়েনারা বিমান হামলা চালিয়ে হত্যা করে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। ধ্বংস করে যাচ্ছে হাযার হাযার বাড়ি-ঘর ও স্থাপনা। কেউ বলছে না মানবতার কথা। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের বলি হয়ে অকাতরে জীবন দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পুরো জনপদকে করে তুলেছে অশান্ত। অথচ এই ইরাকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানগণ। পারসিকদের সাথে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছিলেন। জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি। পারসিকদের পরাজিত করতে মুসলমানদের যে সকল যুদ্ধ করতে হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল কাদেসিয়ার যুদ্ধ। এটা ছিল ইতিহাস পরিবর্তনকারী এক যুদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে এটা ছিল সর্ববৃহৎ যুদ্ধ।

কাদেসিয়ার পরিচয় :

কাদেসিয়া কূফা নগরীর দক্ষিণে ফোরাত নদীর পূর্ব দিকে মরু উপত্যকায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এই এলাকায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় এর নাম হয় 'কাদেসিয়া যুদ্ধ'। পারসিক রাজা কিসরাগণ সেখানে 'মাউল ইরাক' নামে একটি শহর গড়ে তোলেন।

যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল :

কাদেসিয়া যুদ্ধ ১৫ হিজরী সনের ১৩-১৬ শা'বান মোতাবেক ১৬ থেকে ১৯ নভেম্বর ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমান ও রুস্তম ফাররাখযাদের নেতৃত্বে পারসিক খ্রিস্টানের মধ্যে সংঘটিত হয়।[৪০] তবে ইবনু কাছীর (রহঃ) তারিখ উল্লেখ ছাড়াই বলেছেন, এটা ১৪ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল।[৪১]

মুসলিম সৈন্য সংখ্যা :

এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল ত্রিশ হাযার বা তার চেয়ে কিছু বেশী।[৪২] পরে সিরিয়া থেকে ছয় হাযার সৈন্য এসে মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করলে সর্বসাকুল্যে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছত্রিশ হাযারে।[৪৩] এর মধ্যে সত্তর (৭০) জনের বেশী বদরী ছাহাবী ছিলেন। ছয়শর অধিক ছাহাবী ও তাঁদের প্রায় সাতশত সন্তান এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৪৪]

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৪০. *বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান ১/২৫১; খলীফা ইবনু খাইয়াত্ব, তারীখ, পৃঃ ১৩২; মাসঊদী, মুরূজুয যাহাব ২/৩২৮।*

৪১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/৬১৩ (দারুল হিজর); তারীখু ইবনে জারীর ত্বাবারী, ৩/৪৭৯।*

৪২. *তারীখু ত্বাবারী ২/৩৮৪।*

৪৩. *ঐ, ৩/৫৪২-৫৪৩, ৩/৪৮৭ ও ৪৯০; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ২/৩১১।*

৪৪. *ঐ, ৩/৪৯০।*

মুসলিম সেনাপতিবৃন্দ :

এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)। যুদ্ধের কমাণ্ডার ছিলেন খালিদ ইবনু আরফাতাহ (রাঃ)। ডান বাহুর সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মু'তাম (রাঃ) ও বাম বাহুর অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ছিলেন শুরাহবীল ইবনু সামত্ব (রাঃ)। আর পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বাহ (রাঃ)।[৪৫] হাশেম ইবনু উতবা বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ছিলেন সিরিয়া থেকে আগত সৈন্যদের সেনাপতি। তিনি যুদ্ধের তৃতীয় দিন ইরাকী বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আসেন। কা'কা' ইবনু আমর তামীমী (রহঃ) তাঁকে নেতৃত্বে দানে সাহায্য করেন।

অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) ছিলেন যুদ্ধের পতাকাবাহী। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন ইবনু উম্মে মাকতূমকে বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা ছিল।[৪৬]

পারসিক সেনাপতি :

পারস্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন রুস্তম ফাররাখযাদ। তাদের সৈন্য সংখ্যা দুই লাখেরও অধিক ছিল।[৪৭]

পারসিক বাহিনীর অন্যান্য সেনাপতিগণ :

অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্বে ছিল বাহমান হাযুওয়াই যুল হাজেব। যার সাথে আঠারটি হাতি ছিল এবং সেগুলোর উপর বহু সংখ্যক বাক্স ও তীরন্দায সৈন্য ছিল। জালীয়ানুস মূল বাহিনীর কাছাকাছিতে থাকা দক্ষিণ বাহুর দায়িত্বে ছিল। দক্ষিণ বাহুর দায়িত্বে ছিল হুরমুযান। তার সাথে আটটি হাতি এবং সেগুলোর উপর কিছু বাক্স ও সৈন্য ছিল। বীরযান ছিল বাম বাহুর নেতৃত্বে, যা মূল বাহিনীর কাছাকাছি অবস্থান করছিল। অপরদিকে বাম বাহুর সেনাপতি ছিল মেহরান। তার সাথে সাতটি হাতি ছিল। এগুলোর উপরও বাক্স ও সৈন্য ছিল।

যুদ্ধের পটভূমি :

মুসলিম সৈন্যদের বড় একটা অংশ ইরাকে অবস্থান করছিল। ইরাকের ভূমি স্বাধীন করার জন্য তারা পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ যুদ্ধগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'জিসর'-এর (সেতুর) যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এর কিছুদিন পরেই সংঘটিত হয় বুওয়াইবের যুদ্ধ। যাতে পারসিকরা পরাজয় বরণ করে এবং মুসলমানগণ বিরাট বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যভাবে বলা যায়, জিসরের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি বুওয়াইবের যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।

এদিকে বুওয়াইবের যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত পারসিক বাহিনী তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে এবং তারা সম্রাট ইয়াযদাজারদ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। সম্রাট মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাদের প্রধান সেনাপতি হিসাবে রুস্তমের নাম ঘোষণা করেন। এরপর ইয়াযদাজারদ সৈন্যদের সামনে তাদের অতীত উজ্জ্বল ও গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উদ্দীপনা জাগানিয়া বক্তব্য প্রদান করেন। সেই সাথে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ঘোষণা দেন। এরূপ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) পারস্য বিজয়ের কথা চিন্তা করলেন। সাথে সাথে ভৌগলিকভাবে পূর্ব দিক থেকে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে উত্থিত সকল ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করে সারা পৃথিবীতে ইসলামী আক্বীদা প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ফলে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে মদীনার দায়িত্ব অর্পণ করে নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞজনেরা তাঁকে মদীনায় অবস্থান করে রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্য হ'তে কাউকে সেনাপতি নির্বাচন করার পরামর্শ দিলেন।

ইবনুল আছীর বলেন, খলীফা ওমর (রাঃ) মদীনা থেকে বের হয়ে ছারার নামক ভূমিতে অবতরণ করলেন এবং সেখানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। লোকেরা তখনও জানত না যে, তিনি মদীনায় অবস্থান করবেন, নাকি লোকদের সাথে যুদ্ধে যাবেন। ছাহাবীগণ তাঁকে সরাসরি কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতেন না। সেজন্য প্রথমে ওছমান (রাঃ) বা আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতেন। তাঁরা দু'জন সক্ষম না হ'লে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হ'ত। ওছমান (রাঃ) তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি লোকদের জমা করে সকল বিষয়ে বর্ণনা করলেন। অতঃপর ইরাকে যাওয়ার বিষয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সাধারণ সেনারা বলল, আপনি আমাদের সাথে চলুন। এরপর তিনি তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বললেন, তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমি বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করে বের হব। অতঃপর তিনি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে আহবান করলেন। সাথে সাথে মদীনার দায়িত্বে রত আলী ইবনু আবি ত্বালিব, অগ্রগামী সেনা ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সকলে উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা একটি বিষয়ে একমত হ'লেন যে, সেনাপতি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবীকে নির্বাচন করা হোক এবং খলীফা মদীনায় অবস্থান করে সৈন্য পরিচালনার দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) সেনাদের ডেকে বললেন, আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞ পরামর্শদাতাগণ আমাকে উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি মদীনায় অবস্থান করে রাসূল (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবীকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই।

---

৪৫. *সামী আব্দুল্লাহ মাগলূছ, আত্বলাসুল খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), পৃঃ ৭২।*
৪৬. *ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়া হা/৪০৩৪; আবু ইয়া'লা হা/৩১১০; আহমাদ হা/১২৩৬৬।*
৪৭. *তারীখু ত্বাবারী ২/৩৯৪।*

Contents

তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। লোকেরা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করে তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ফলে ওমর (রাঃ) সা'দ (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন করলেন। কেননা তিনি জ্ঞান-গরিমায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৪৮]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) প্রথম সারির ছাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, প্রথমদিকে হিজরতকারী এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি আমার মামু। সম্মানের ক্ষেত্রে আমার মামুর মত আর কার মামু আছে'? কেননা তিনি ও রাসূল (ছাঃ)-এর মা আমেনা একই বনু যোহরা গোত্রের ছিলেন। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) তাকে মামু বলতেন।[৪৯] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, ওহোদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার তূণীর এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'হে সা'দ আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গীত হৌন! তুমি কাফেরদের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপ কর'।[৫০] তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য আল্লাহ্র পথে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার দো'আ কবুল কর এবং তার তীর নিক্ষেপ সুনিপুণ কর'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! তুমি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী কর এবং তার দো'আ কবুল কর'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'হে আল্লাহ! সা'দ যখন দো'আ করবে তুমি তার দো'আ কবুল কর'।[৫১] সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) যখনই দো'আ করতেন, তাঁর দো'আ কবুল করা হ'ত।[৫২]

যুদ্ধের কারণ :

(১) ইরাক থেকে মুসলিম শক্তিকে হঠানোর উদ্দেশ্যে পারস্যের জোটগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া : যখন মুসলমানগণ বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করে হীরা, আইনুত তামার ও আনবারের মত শহরগুলো পদানত করে ফেললেন, তখন পারসিকরা ভাবল নিজেরা বিচ্ছিন্ন থেকে ইসলামী শক্তিকে বাধা দেওয়া যাবে না। ফলে তারা সাসানী সাম্রাজ্যের সম্রাট ইয়াযদাজারদ ইবনু শাহরিয়ারের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। এভাবে পারস্যের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হ'ল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইরাক থেকে হটিয়ে দেওয়ার দূরভিসন্ধি আঁটল।[৫৩]

(২) ইরাকের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করা : ইরাকের ইসলামী খেলাফতের মর্মমূলে আঘাত করার জন্য পারস্য সেনাপতি রুস্তম ইরাকের গোত্র প্রধানদের গোপনে ডেকে তাদেরকে ইসলামী খেলাফতের অবাধ্য হ'তে ও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উত্তেজিত করেন। ফলে হীরা সহ খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ও মুছান্না ইবনু হারেছাহ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল সমূহে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা দেখা দিল। এভাবে তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমানদের ক্রুদ্ধ করে তুলল।[৫৪]

সেনাপতি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়ে এবং এ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানিয়ে পারস্য সম্রাটের নিকট একদল বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রতিনিধি পাঠালেন। তারা মাদায়েনে গিয়ে তাদেরকে হিকমত ও সুন্দর উপদেশ দানের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কোন ফলাফল ছাড়াই বৈঠক শেষ হ'ল। ফলে কাদেসিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

যুদ্ধের ঘটনা :

খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করলেন। সা'দ (রাঃ) ক্বিদ্দীস ভবনের নিকটে কাদেসিয়ার উপযুক্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। মুসলিম সেনাবাহিনী এ স্থানে এক মাস যাবৎ অবস্থান করল। কিন্তু শত্রু বাহিনীর সাক্ষাৎ পেল না। অবশেষে তারা ধারণা করল যে, হয়ত আর কোন যুদ্ধ হবে না। কিন্তু এক মাস পর পারস্য বাহিনী সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে সেখানে এসে যথাস্থানে অবস্থান নিল।

পারসিক সেনাপতি রুস্তম মুসলিম সেনাপতি সা'দ (রাঃ)-এর কাছে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আলাপ-আলোচনা ও কিছু প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার জন্য একজন বিজ্ঞ লোক পাঠান হোক। রুস্তমের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে কালক্ষেপণ করে যুদ্ধ ব্যতীত মুসলিম সৈন্যদের বিরক্ত ও ক্লান্ত করে তোলা। ফলে মুসলমানেরা দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলবে এবং অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাবে। সেনাপতি সা'দ (রাঃ) এটাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার মুখ্য সুযোগ মনে করে একে একে তিনজন বিজ্ঞ প্রতিনিধিকে রুস্তমের কাছে প্রেরণ করলেন। ইতিপূর্বে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য হীরা এবং ছালুবায় লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা সংবাদ পাঠাল যে, পারস্য সম্রাট তার বিশাল বাহিনী দিয়ে রুস্তমকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তখন সা'দ (রাঃ) এ খবর জানিয়ে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন। উত্তরে ওমর (রাঃ) লিখলেন যে, তাদের এ ধরনের সংবাদ তোমাকে যেন কখনই বিচলিত এবং চিন্তিত না করে। বরং তুমি সর্বদা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাঁর উপরই ভরসা করবে। আর সেনাপতি রুস্তমের কাছে একজন বিজ্ঞ ও সচেতন লোক পাঠাবে, যে তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ দাওয়াতকে তাদের মধ্যে দুর্বলতার কারণ বানাবেন এবং তাদের ঐক্যে

৪৮. *তারীখু ত্বাবারী, ৩/৪৭৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ২/২৯৯।*
৪৯. *হাকেম হা/৬১১৩; তিরমিযী হা/৩৭৫২; মিশকাত হা/৬১১৮।*
৫০. *বুখারী হা/২৯০৫; মুসলিম হা/২৪১২; মিশকাত হা/৬১০৩।*
৫১. *হাকেম হা/৪৩১৪, ৬১২২; বাযযার হা/১২১৩; আবু নু'আইম, মা'রিফাতুছ ছাহাবা হা/৫০৭।*
৫২. *সৈয়ূতী, আল-খাছায়েছুল কুবরা ৩/৬৮।*
৫৩. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৪৭৭-৪৭৮।*
৫৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৬১৩।*

Contents

চিড় ধরাবেন'। অতঃপর রুস্তম যখন তার সৈন্য নিয়ে কাছাকাছি স্থানে অবতরণ করেন, তখন সা'দ (রাঃ) খলীফার নিকট সব জানিয়ে পত্র লিখলেন। যাতে শত্রু পক্ষের ঘোড়াসমূহ এবং তেত্রিশটি হাতির উল্লেখ ছিল।[৫৫] এরপর সা'দ (রাঃ) একদল বিজ্ঞ ছাহাবীকে রুস্তমের কাছ পাঠালেন। তাদের মধ্যে ছিলেন নু'মান ইবনু মুকারিন, ফুরাত ইবনু হিব্বান, হানযালা, উত্বারেদ, আশ'আছ, মুগীরা ইবনু শু'বা, আমর ইবনু মা'দীকারিব প্রমুখ। তাঁরা রুস্তমকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিলেন। তখন রুস্তম তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ? তারা বললেন, আমরা এখানে এসেছি আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূরণের জন্য এবং এদেশ দখল করে আপনাদের নারী ও সন্তানদের বন্দি ও সম্পদসমূহ গ্রহণ করার জন্য। আর এ বিষয়ে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'। অবশ্য রুস্তম ইতিপূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আকাশ থেকে যেন একজন ফেরেশতা এসে পারস্য বাহিনীর সকল অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে অর্পণ করলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হাতে সমর্পণ করলেন।[৫৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রিবঈ ইবনু আমের, হুযায়ফা ইবনু মিহছান ও মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ)-কে আলাদা আলাদাভাবে রুস্তমের কাছে পাঠান। রিবঈ ইবনু আমের (রাঃ) যখন স্বীয় জীর্ণ-শীর্ণ মোটা পোশাক পরে অস্ত্র নিয়ে তাঁর ছোট ঘোড়াটির উপর আরোহণ করে রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন এবং ঘোড়ার পদাঘাতে ঘরে বিছানো গালিচা ফেটে গেল। তখন তারা বলল, অস্ত্র রেখে প্রবেশ কর। রিবঈ ইবনু আমের (রাঃ) বললেন, আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। আপনারা ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই এসেছি। যদি আপনারা আমাকে এ অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ করতে দেন, তাহ'লে প্রবেশ করব, অন্যথায় ফিরে যাব। তখন সৈন্যরা রুস্তমকে তার কথা বললে তিনি প্রবেশের অনুমতি দিলেন। রিবঈ (রাঃ) তার বর্মের উপর ভর দিয়ে প্রবেশ করার কারণে অধিকাংশ গালিচা ছিঁড়ে গেল। অতঃপর তারা বলল, তোমরা এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এখানে আসার ব্যবস্থা করেছেন। যাতে আমরা তাঁর ইচ্ছায় লোকদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহ্র দাসত্বে, সংকীর্ণ পৃথিবীর মোহ হ'তে প্রশস্ত জান্নাতের দিকে, খ্রিস্টান ধর্মের অত্যাচার থেকে বের করে ন্যায় ও ইনছাফের ধর্ম ইসলামের দিকে নিয়ে যেতে পারি। তিনি আমাদেরকে তাঁর সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন মানবজাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য। যারা এ ধর্ম গ্রহণ করবে, আমরা তাদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করব এবং তাদেরকে নিরাপদে রেখে ফিরে যাব। আর যারা এ ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করতে থাকব, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেন।

৫৫. ঐ, ৭/৩৮।
৫৬. ঐ, ৭/৪৫।

তারা বলল, আল্লাহকৃত ওয়াদা (موعود الله) কি?

তিনি বললেন, ইসলাম অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা মারা যাবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য বিজয়।

রুস্তম বললেন, আমি তো তোমাদের বক্তব্য শুনলাম, আমরা কি এ বিষয়টিকে বিলম্বিত করতে পারি না? যাতে আমরা উভয় পক্ষ ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

তিনি বললেন, হ্যাঁ করা যায়। তবে কয়দিন চান, একদিন না দু'দিন?

তিনি বললেন, না। বরং আমাদের বিজ্ঞ ও জ্ঞানীদেরকে অবহিত না করা পর্যন্ত।

রিবঈ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য এই সুন্নাত চালু করেননি যে, আমরা শত্রুদেরকে তিনদিনের বেশী অবকাশ দিব। বরং আপনার এবং তাদের বিষয় ভেবে দেখুন ও তিনটির যেকোন একটি বেছে নিন। ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান অথবা যুদ্ধ।[৫৭]

রুস্তম রিবঈ ইবনু আমের (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কি তাদের সরদার?

রিবঈ (রাঃ) বললেন, না। তবে মুসলমানগণ একটি দেহের মত। তাদের সব থেকে নিম্নস্তরের ব্যক্তি উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের রক্ষা করে (নেতৃত্ব দিতে পারে)।

অতঃপর পারসিক সেনাপতি রুস্তম গোত্রপতিদের সমবেত করে বললেন, তোমরা কি কখনও এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ও বাগ্মিতাপূর্ণ কথা শুনেছ? তারা বলল, আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। আপনি কি এ লোকটির প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন এবং নিজের ধর্ম ত্যাগ করে এই কুকুরের ধর্মের দিকে ধাবিত হচ্ছেন (وتدع دينك إلى هذا الكلب)? আপনি কি তার পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করেছেন? রুস্তম বললেন, তোমাদের জন্য ধ্বংস হোক, তোমরা তার পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করো না; বরং তার সুচিন্তিত মতামত, প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য এবং নীতির প্রতি লক্ষ্য কর। আরবরা অনাড়ম্বর কাপড় পরে, কম ভক্ষণ করে। কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করে।[৫৮]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রুস্তম যখন রিবঈ ইবনু আমেরের সাথে কথা বলে মুসলমানদের দৃঢ় মনোবলের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি অন্য মুসলমানদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাঠাবার জন্য সা'দ (রাঃ)-এর কাছে পত্র লিখলেন। সা'দ (রাঃ) পত্র পেয়ে মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ)-কে পাঠালেন। রুস্তম মুগীরা (রাঃ)-কে তার প্রচণ্ড রাগ প্রদর্শন করে বললেন, তোমাদের দৃষ্টান্ত হ'ল মাছির মত। যে মধু দেখে আমাদের ভূমিতে প্রবেশ করে বলল, যে

৫৭. তারীখু ত্বাবারী ৩/৫২০; আল-বিদায়াহ ৯/৬২২।
৫৮. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী ৩/১৭০; আবুল হাসান নদভী, সীরাতুননবী ১/১১৩; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/৬২৩; দারুল হিজর; মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী, হায়াতুছ ছাহাবা ১/২৫০।

আমাকে মধুর কাছে পৌঁছে দিবে তাকে দুই দিরহাম দেওয়া হবে। অতঃপর যখন সে মধুতে পড়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হ'ল, তখন সে মুক্ত হওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করল। কিন্তু সে কোন রক্ষাকারী না পেয়ে বলা শুরু করল, যে আমাকে রক্ষা করবে তার জন্য চার দিরহাম রয়েছে। তিনি আরো বললেন, তোমাদের উদাহরণ ঐ দুর্বল শৃগালের মত, যে ফলের বাগানের একটি গর্তে প্রবেশ করল এবং আল্লাহ যতদিন চাইলেন ফল খেয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকল। বাগানের মালিক এসে দেখল যে, এটি একটি দুর্বল প্রাণী। তাই তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু যখন তার বসবাস দীর্ঘায়িত হ'ল এবং ফল ভক্ষণ করে স্বাস্থ্য ভাল হ'ল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে উঠল, তখন সে বাগানের অনেক কিছুই নষ্ট করতে শুরু করল। ফলে বাগানের মালিক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে লোকজন নিয়ে বাগানে আসল এবং রাখালদের সহযোগিতা কামনা করল। এ দিকে শৃগাল পলায়ন করার জন্য পথ খুঁজে না পেয়ে যে সুড়ঙ্গ দিয়ে বাগানে প্রবেশ করেছিল সেই গর্তে প্রবেশ করল। কিন্তু সে অতি মোটা হয়ে যাওয়ায় বের হ'তে পারল না। শিশুরা তাকে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। ফলে তারা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

এভাবেই তোমরা আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত হবে। অবশ্য আমি জানি, হে আরব সম্প্রদায়! ক্ষুধার তাড়না তোমাদেরকে এদেশে আসতে বাধ্য করেছে। তোমরা আমাদেরকে প্রাসাদ নির্মাণ ও শত্রুদমন থেকে ব্যস্ত রেখেছ। অতএব তোমরা ফিরে যাও, আমরা যব ও খেজুর দিয়ে তোমাদের বাহন ভরে দিব এবং তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দিব। তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন।

মুগীরাহ বিন শু'বা (রাঃ) বললেন, ক্ষুধার তাড়নার কথা বলবেন না। আপনি যা বললেন, তার থেকেও আমরা কষ্টে ছিলাম। জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ছিল, যে তার চাচাতো ভাইকে হত্যা করে চাচার সকল সম্পদের মালিক হ'ত এবং তা ভক্ষণ করত। আমরা মৃত প্রাণী, তাদের রক্ত ও হাড় খেতাম। এভাবে আমাদের জীবন চলছিল। এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠালেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করলেন। তিনি এই কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অহি-র প্রতি আহ্বান জানালেন। অতঃপর আমাদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করল এবং কেউ তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। এরপর তিনি বিশ্বাসীদের সাথে নিয়ে মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। অতঃপর আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করলাম। অবশেষে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। এরপর তিনি আমাদেরকে বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, যারা এপথে যুদ্ধ করে নিহত হবে, তাদের জন্য রয়েছে সুখময় জান্নাত। আর যারা জীবিত থাকবে তারা রাজ্য পরিচালনা করবে এবং বিরোধীদের উপর সফলকাম হবে। এখন আমরা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনুন এবং আমাদের ধর্মে প্রবেশ করুন। আপনি যদি এটা মেনে নেন, তাহ'লে এ রাজ্য আপনারই থাকবে। এখানে আপনার প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবে না। তবে যাকাত ও গণীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবেন। আর ইসলাম গ্রহণ না করলে, জিযিয়া দিয়ে নিরাপদে বাসবাস করবেন। আর যদি এর কোনটাই গ্রহণ না করেন, তাহ'লে আল্লাহ যতদিন না আমাদের মধ্যে ফায়ছালা করবেন, ততদিন যুদ্ধ চলতে থাকবে।[৫৯]

সব কথা শুনে রুস্তম বললেন, তোমরা তো আমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের সাথে আমরা ভাল আচরণ করে থাকি। তোমাদের বিপদ-আপদে সাহায্য করে থাকি। অতএব তোমরা দেশে ফিরে যাও। আমাদের দেশের সাথে বাণিজ্য করতে তোমাদের কোন বাধা দিব না। মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) বললেন, আমরা দুনিয়ার কোন কিছুই চাই না। আমাদের একান্ত চাওয়া-পাওয়া হ'ল পরকাল।[৬০]

এরপর রুস্তম বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের হত্যা করব। মুগীরা বললেন, আপনারা আমাদের হত্যা করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব। আর আমরা আপনাদের হত্যা করলে আপনারা জাহান্নামে যাবেন। অতঃপর রুস্তম সূর্যের নামে কসম করে বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের হত্যা করব। তখন মুগীরা (রাঃ) বললেন, অচিরেই জানা যাবে কে কাকে হত্যা করে।

অতঃপর রুস্তম মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ)-কে বললেন, আমি তোমাদের কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ, তোমাদের আমীরের জন্য এক হাযার দীনার এবং কাপড় ও বাহন দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা আমাদের দেশ থেকে ফিরে যাও। মুগীরা (রাঃ) বললেন, এটা খুব দূরে নয় যে, আমরা আপনাদের রাজ্যকে দুর্বল করে দিব, শক্তিশালীদের হীনবল করব এবং আপনাদের এদেশ আমাদের হয়ে যাবে। অতঃপর আপনারা নীচু হয়ে আমাদেরকে জিযিয়া দিবেন এবং আপনারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দাসে পরিণত হবেন'। এ কথা শুনে তারা চিৎকার দিয়ে বলল, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সন্ধি হবে না।[৬১]

এরপর মুগীরাহ বিন শু'বা (রাঃ) রুস্তমকে বললেন, তাহ'লে আপনারা নদী পার হয়ে আসবেন, না আমরা নদী পার হয়ে যাব? রুস্তম বললেন, বরং আমরা নদী পার হয়ে গিয়ে যুদ্ধ করব। এরপর তারা পার হয়ে না আসা পর্যন্ত মুসলমানগণ অপেক্ষা করলেন। তারা যখন পার হয়ে আসল তখন মুসলমানগণ তাদের উপর হামলা করে পরাস্ত করলেন।[৬২]

---

৫৯. *ইবনু হিব্বান, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়াহ ওয়া আখবারুল খুলাফা ১/৪৫২; তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৭৪; আল-বিদায়াহ ৯/৬২৩।*
৬০. *ঐ, ৭/৪৬; আল-কামিল ২/২৯৭; তবে ছাহাবী মুগীরার স্থানে যুহরার কথা উল্লেখ আছে।*
৬১. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৪৯৬; আল-বিদায়াহ ৭/৪৮; হায়াতুছ ছাহাবা ১/২৬১।*
৬২. *আল-বিদায়াহ ৭/৪০, দারুল ফিকর; তারীখু ত্বাবারী ৩/৪৯৬।*

Contents

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করে দেখুন, মুসলমানগণ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পাঁচ বারেরও অধিক একাধিক ব্যক্তিকে রুস্তমের সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং ইসলামের যুদ্ধনীতির শান্তিপূর্ণ দিকটি ফুটে ওঠে।

যুদ্ধের পূর্বে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বাহনে আরোহণ করতে অক্ষম হয়ে গেলেন। ফলে তিনি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন খালিদ ইবনু আরফাত্বাহ (রাঃ)-কে এবং নিজে ক্বিদ্দীস ভবনের ছাদে উঠে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও ইবনু আরফাত্বাহকে নির্দেশনা দিতে থাকলেন।

অপরদিকে রুস্তম তার সৈন্যদের কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করলেন এবং সার্বিক সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে সতর্ক করলেন। এটা ছিল চারদিন ব্যাপী কঠিন একটি যুদ্ধ। আরবরা এদিন প্রথম রাতে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। যা ছিল তাদের রীতিবিরুদ্ধ।

যুদ্ধের প্রথম দিন : আরমাছ

'রমছ' (رمث) শব্দের অর্থ হ'ল মিলে যাওয়া। যেহেতু এ দিনে বিশাল দু'দল সৈন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একে অপরের মধ্যে মিশে গিয়েছিল, সেজন্য এদিনকে 'আরমাছ' (أرماث) বলা হয়। এ দিনে যুদ্ধের কোন ফলাফল আসেনি। তবে মুসলমানগণ এ দিনে তেত্রিশটি হাতির দল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। যেগুলিকে সেনাপতি রুস্তম তিনভাগে ভাগ করেছিলেন। যাদের মধ্যে একটি সাদা হাতিও ছিল। মূল বাহিনীতে ছিল আঠারটি হাতি, দক্ষিণ বাহুতে আটটি এবং বাম বাহুতে ছিল সাতটি।

যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সা'দ (রাঃ) সূরা আনফাল পাঠের নির্দেশ দিলেন। জিহাদের সূরা পাঠ করা হ'লে মুসলমানদের হৃদয় ও চোখ আনন্দে ভরে গেল এবং তারা প্রশান্তি লাভ করলেন। এ সূরা পাঠ শেষ হ'লে সেনাপতি সা'দ (রাঃ) বললেন, যোহর ছালাত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করবে। ছালাত শেষে আমি চারটি তাকবীর ধ্বনি দিব। আমি তাকবীর দিলে তোমরাও তাকবীর দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যখন দ্বিতীয় তাকবীর শুনবে, তোমরা তাকবীর দিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরবে। আমি তৃতীয় তাকবীর দিলে তোমরা তাকবীর দিয়ে ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করবে। আর চতুর্থ তাকবীর দিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং বলবে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ 'লা হাওলা ওয়া লা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত)'।[৬৩]

যুদ্ধের পূর্বে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) আরবের বিজ্ঞ ব্যক্তি, সুবক্তা, সুপরামর্শদাতা ও কবিদের একত্রিত করলেন। অতঃপর তাদেরকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সৈন্যদের সামনে গিয়ে উৎসাহপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা গিয়ে সৈন্যদের সামনে বক্তব্য প্রদান ও কবিতা আবৃত্তি করার মাধ্যমে তাদেরকে উদ্দীপিত করে তুললেন।[৬৪]

(১) ক্বায়েস বিন হুবায়রাহ আল-আসাদী বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র প্রশংসা কর, যিনি তোমাদেরকে যে পথের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যার দ্বারা পরীক্ষা করেছেন সেজন্য। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে বেশী করে দিবেন। তোমরা আল্লাহ্র নে'মত সমূহ স্মরণ কর এবং তার সন্তুষ্টি লাভে মনোনিবেশ কর। তোমাদের সামনে রয়েছে জান্নাত নতুবা গণীমত। আর এ ভবনের পিছনে তৃণবিহীন প্রান্তর, নির্জন মরুভূমি, শুষ্ক পাত্র এবং দুর্গম এলাকা ছাড়া কিছুই নেই।[৬৫]

এরপর (২) গালেব আল-আসাদী দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহ এ যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করায় তোমরা তাঁর প্রশংসা কর। তোমরা তাঁর কাছে চাও। তিনি তোমাদের বেশী বেশী দিবেন! তোমরা প্রার্থনা কর তিনি কবূল করবেন। হে অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যগণ! ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় আজকে তোমাদের কেউ দুর্বল করতে পারবে না। আর তোমাদের সাথে যা (তরবারী) আছে, তা তোমাদের অবাধ্য হবে না। আগামী দিন লোকেরা কি আলোচনা করবে তা চিন্তা কর। কারণ তোমাদেরকে দিয়ে তাদের আগামীকাল শুরু হবে। আর তোমাদের পরবর্তীদের প্রশংসা করা হবে'। অতঃপর (৩) ইবনু হুযায়েল আসাদী দাঁড়িয়ে বললেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা তরবারীকে রক্ষাকারী হিসাবে গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে কাল দুর্গের ন্যায় হয়ে যাও। তাদের জন্য নেকড়ের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হয়ে যাও। চিৎকার ধ্বনিকে বর্ম পরাও, আল্লাহ্র উপর আস্থাশীল হও এবং চক্ষু অবনমিত রাখ। যখন তরবারী উন্মুক্ত হয়, তখন তা অনুগত হয়ে যায়। আর তোমরা তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। কেননা পাথর এমন কিছু ঘটাবে যা লোহা ঘটাতে পারে না।

ইবনু হুযায়েলের বক্তব্য শেষ হ'লে (৪) বিশর বিন আবী রুহম জুহানী দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র প্রশংসা কর এবং কাজের মাধ্যমে তোমাদের কথাগুলোকে সত্যে পরিণত কর। তোমাদের হেদায়াতের জন্য তোমরা তো আল্লাহ্র প্রশংসা করেছ এবং তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করেছ। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তোমরা তার বড়ত্বও বর্ণনা করেছ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ। অতএব তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অন্য সব কিছু থেকে সহজভাবে গ্রহণ করবে। কেননা দুনিয়া তার কাছে আসে, যে তাকে তুচ্ছ মনে করে। তোমরা তার দিকে ধাবিত হয়ো না। কারণ তা পলায়ন

৬৩. *আল-কামিল ২/৪০৯।*

৬৪. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৩৩।*

৬৫. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৩৩-৫৩৪।*

করবে। আর তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

বিশর ইবনু আবী রুহম বক্তব্য শেষ করলে (৫) আছেম ইবনু আমের তামীমী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আরব সম্প্রদায়! তোমরা তো আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তোমরা অনারবদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছ। তোমরা জান্নাত লাভের ঝুঁকি নিয়েছ, আর তারা দুনিয়া প্রাপ্তির ঝুঁকি নিয়েছে। অতএব তোমাদের কাছে দুনিয়া যেন কখনও পরকালের উপর গুরুত্ব না পায়। তোমরা আজকের দিনে এমন ঘটনা সংঘটিত করো না, যা পরবর্তীতে আরবদের জন্য কলঙ্কজনক হয়ে থাকবে।

এরপর (৬) রিবঈ বিন আমের (রাঃ) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের হেদায়াত দান করেছেন এবং এর উপর ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আর অশেষ নে'মত দেওয়ার কথা বলেছেন। ধৈর্যধারণের মধ্যেই রয়েছে প্রশান্তি। তোমরা ধৈর্যধারণে নিজেদের অভ্যস্ত কর, তাহ'লে ধৈর্যশীল হ'তে পারবে। তোমরা অস্থিরতার অভ্যাস করো না, তাহ'লে ধৈর্যহারা হবে।[৬৬]

অপরদিকে পারস্য বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নিল। তারা তাদের সৈন্যদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করল। এরপর সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তৃতীয় বার তাকবীর দিলে গালিব বিন আব্দুল্লাহ আযদী দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য সামনে বের হ'লেন। তাকে দেখে শত্রুপক্ষের হুরমুয এগিয়ে আসল। গালিব তাকে ধরাশায়ী করে সা'দ (রাঃ)-এর কাছে বন্দি করে আনলেন। এরপর তুলায়হা আসাদী সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের কতিপয় বড় বড় নেতাকে হত্যা করলেন।[৬৭]

অতঃপর সা'দ (রাঃ) ক্বিদ্দীস ভবনের ছাদের উপর থেকে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ব্যাপক যুদ্ধের ঘোষণা করলেন। ফলে উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধ করছে, আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য এবং পারস্যবাসী ও কিসরার সন্তানদের অগ্নিপূজা থেকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। অপরদিকে পারস্য বাহিনী যুদ্ধ করছে সম্রাট ইয়াযদাজারদ ও তাঁর সন্তানদের জন্য, যারা আল্লাহকে ছেড়ে আগুনের পূজা করে তাদের রক্ষা করার জন্য।

এদিকে পারস্য বাহিনীর হাতি স্কোয়াড বনু আসাদ গোত্রের উপর হামলা করল। ইতিপূর্বে আরবের ঘোড়াগুলোর কখনও যুদ্ধে হাতি দেখার অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে ঘোড়াগুলো ভড়কে গেল। এতে বনু আসাদের কাতার সমূহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'ল। এই সুযোগে পারস্য বাহিনী তাদের উপর হামলা জোরদার করল এবং হাতিগুলো ঘুরে ঘুরে হামলা করতে থাকল। সেনাপতি সা'দ (রাঃ) উপর থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করে কা'কা' (রাঃ)-এর ভাই আছেম ইবনু আমরকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আছেম ছিলেন তামীম গোত্রের। যারা ঘোড়া এবং উট পরিচালনার কৌশল খুব ভাল করেই জানত।

ইবনু জারীর বলেন, সা'দ (রাঃ) আছেমকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বললে তিনি বনু তামীমকে বললেন, হে বনু তামীম! তোমরা কি উট এবং ঘোড়ার মালিক নও? এসব হাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন কৌশল কি তোমাদের জানা নেই? তারা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! আমাদের জানা আছে। অতঃপর তিনি তাঁর কওমের কিছু তীরন্দায ও কিছু অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, হে তীরন্দায দল! তোমরা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে হাতির উপরে থাকা সৈন্যদের পরাস্ত কর। আর হে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ! তোমরা হাতির পিছনে গিয়ে হাওদা কেটে ফেল। তিনি বনু আসাদকে সাহায্যের জন্য বের হ'লেন। তখনও হাতি পা দিয়ে বনু আসাদ গোত্রকে পিষ্ট করছিল। আছেমের সাথীরা হাতির পিছন দিক থেকে এসে তাদের হাওদা এবং বাক্সের রশিগুলো কেটে ফেলল। এতে হাতিগুলোর চিৎকার বেড়ে গেল। সেদিন এমন কোন হাতি ছিল না যার হাওদাজ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি এবং তাদের উপরে থাকা লোকদের হত্যা করা হয়নি। মুসলিম সৈন্যরা আবার সামনে ফিরে আসল এবং বনু আসাদের উপর আপতিত বিপদ দূর করতে সক্ষম হ'ল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকল। পারস্য বাহিনী তাদের ঘাঁটিতে ফিরে গেল। ঐদিন সন্ধ্যায় বনু আসাদের পাঁচশত লোক শহীদ হয়।[৬৮]

আরমাছ (أرماث)-এর দিন মুসলমানের জন্য খুবই দুর্বিষহ ছিল। কিন্তু তারা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। দিনের শেষ অবধি ক্লান্তিহীনভাবে বীরত্বের সাথে তারা শত্রুদের মুকাবিলা করে হস্তিবাহিনীর বিপর্যয় থেকে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন : আগওয়াছ (أغواث)

'আগওয়াছ' (أغواث) 'গাওছ' (غوث) শব্দের বহুবচন, অর্থ সাহায্য। যেহেতু হাশেম বিন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ছয় হাযার সৈন্য সিরিয়া থেকে সাহায্যকারী হিসাবে আগমন করে, যার প্রথম দলে এক হাযার সৈন্য নিয়ে তিনি কা'কা' বিন আমর তামীমীকে পাঠিয়ে দেন। এজন্য এই দিনকে গাওছ (غوث) তথা সাহায্য প্রাপ্তির দিন বলা হয়। শহীদগণের জন্য খননকৃত (উযায়েব ও আয়নুশ শামস এর মধ্যবর্তী স্থানে) কবরে দাফন করার জন্য এবং আহতদের চিকিৎসা কেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ এ দিনের সূচনা করে। যখন শহীদ ও আহতদের উযায়েবের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনই কা'কা' ইবনু আমর (রাঃ) সিরিয়া থেকে আগমন করলেন।

এ দিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এই যে, এদিন হস্তী বাহিনীর সমাবেশ ঘটেনি। কারণ প্রথম দিন সকল হাতির

৬৬. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৩৫; সুলায়মান হিময়ারী, আল-ইকতেফা ২/৪৬৮; আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী-তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম ৪/১৭২।*

৬৭. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৩৫; আল-মুনতাযাম ৪/১৭২।*

৬৮. *ঐ ২/৪১২।*

উপরে বেঁধে রাখা বাক্স ও হাওদাজ মুসলমান সৈন্যরা কেটে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে পারসিক সৈন্যরা হাতির উপর নতুন বাক্স ও হাওদাজ স্থাপন করতে ব্যস্ত ছিল।

কা'কা' ইবনু আমর যখন যুদ্ধের ময়দানে পৌছলেন তখন মুসলমান সৈন্যরা পারসিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তিনি মুসলমান সৈন্যদের হৃদয় থেকে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক দূর করে তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করলেন। কৌশল হিসাবে তিনি তার সাথে থাকা সৈন্যদের একশ' জনকে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক দলকে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা তার কমাণ্ড অনুযায়ী একশ' জন করে তাকবীর দিয়ে ময়দানে প্রবেশ করল। তাদের তাকবীর শুনে অন্যান্য সৈন্যরাও তাকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করল। এতে মুসলমান সৈন্যদের মনে শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পেল এবং পারস্য বাহিনী হীনবল হয়ে পড়ল। এভাবে কা'কা' ইবনু আমরের পরিচালনায় সিরিয়া থেকে আগত সাহায্যকারী বাহিনী তাদের সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।[৬৯]

এরপর কা'কা' ইবনু আমর কাতার থেকে সামনে এসে বললেন, হে পারস্য বাহিনী! তোমাদের কে আছে যে আমার সাথে লাড়াই করবে? এ কথা শুনে সেনাপতি যুল হাজেব বাহমন জাযুওয়াইহ এগিয়ে আসল। কা'কা' বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি বাহমান জাযুওয়াইহ্। তখন তিনি বললেন, হে আবু ওবায়েদের হত্যাকারী ও জিসরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! এরপর দু'জনে যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। কা'কা' নিমেষেই তাকে খতম করে দিলেন। কা'কা' আবার বললেন, কে আছে আমার সাথে যুদ্ধ করবে? তখন পারস্য সেনাপতি বীরযান ও বান্দুওয়ান ছুটে আসল। এ দৃশ্য দেখে মুসলিম সেনা হারেছ বিন যুবইয়ান সামনে অগ্রসর হ'লেন। কা'কা' বীরযানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিমিষেই তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। আর হারেছ বান্দুয়ানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন এবং তিনিও ক্ষণিকের মধ্যে বান্দুয়ানের দেহ থেকে মস্তক আলাদা করে দিলেন। কা'কা' বলা শুরু করলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা তরবারী দিয়ে তাদের মুকাবিলা কর। কেননা এর মাধ্যমে লোকদের হত্যা করা যায়। অতঃপর লোকেরা তার উপদেশ গ্রহণ করে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। কা'কা' ইবনু আমর এ দিন ত্রিশজন সৈন্যকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করতে সক্ষম হন। আবুবকর (রাঃ) বলেন, সে সৈন্যদল পরাজিত হবে না, যাদের মধ্যে কা'কা' ইবনু আমর থাকবেন।[৭০]

এরপর মুসলমান সৈন্যরা হস্তিবাহিনীর অনুপস্থিতিকে কাজে লাগাল। তাদের উটগুলোকে কালো পোষাক পরিয়ে দিল এবং বড় বড় হাওদাজ তৈরী করে সেগুলোর উপর স্থাপন করল এবং দশজন করে তার উপর আরোহণ করল। এ দৃশ্য দেখে পারস্য বাহিনীর ঘোড়াগুলো ভয়ে পিছিয়ে গেল।[৭১]

আবু মেহজান ছাক্বাফী গাওছের দিন অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি মূলতঃ পারসিক মুসলিম ছিলেন। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান সত্ত্বেও যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইবনু সীরীন বলেন, আবু মেহজান মদ্যপানের অপরাধে প্রায়ই বেত্রাঘাতের শাস্তি ভোগ করতেন। যখন অতি মাত্রায় মদপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখন তাকে বেঁধে উম্মে ওয়ালাদ যাবরার দায়িত্বে আটক রাখা হ'ল। আবু মেহজান কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিনে মুসলমানদের নিহত হ'তে দেখে আফসোস করে বললেন, আমার দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মুসলমানদের ঘোড়াগুলোকে বর্শা দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে, অথচ আমাকে আবদ্ধ অবস্থায় সকাল করতে হচ্ছে...। তখন তিনি সেনাপতি সা'দ (রাঃ)-এর স্ত্রী সালমার কাছে পত্র মাধ্যমে সংবাদ পাঠালেন যে, আবু মেহজান আপনাকে বলছে, আপনি যদি তাকে মুক্ত করে দেন এবং এই [সা'দ (রাঃ)-এর] ঘোড়ার উপর আরোহণ করতে দেন ও তার কাছে অস্ত্র প্রদান করেন, তাহ'লে আবু মেহজান শাহাদত বরণ না করলে সবার আগে আপনার কাছে ফিরে আসবে। অতঃপর যাবরা তার শিকল খুলে দিয়ে উক্ত ঘোড়াটি ও তরবারীটি দিয়ে দিলেন। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে নিমিষেই সৈন্যদের সাথে মিলিত হ'লেন এবং তাকবীর ধ্বনি দিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। অতঃপর যাকেই সামনে পাচ্ছিলেন তাকেই হত্যা করে বীরদর্পে সামনের দিকে এগোতে থাকেন। এদিকে সা'দ (রাঃ) আবু মেহজানকে ছাদের উপর থেকে দেখছিলেন, আর অবাক হয়ে ভাবছিলেন যে, কে এই অশ্বারোহী? যুদ্ধ শেষে আবু মেহজান কয়েদখানায় ফিরে এসে ঘোড়া ও অস্ত্র ফেরত দিলেন এবং তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হ'ল। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) যখন তার পূর্ণ বিবরণ জানতে পারলেন, তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, মদ পানের জন্য তোমাকে আর কখনও বেত্রাঘাত করব না। তখন আবু মেহজান বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আর কখনও মদ পান করব না।[৭২]

সালমা (রাঃ)-এর উৎসাহ :

সালমা ছিলেন অন্যতম মুসলিম সেনাপতি মুছান্না ইবনু হারেছা (রাঃ)-এর বিধবা স্ত্রী। পরে সা'দ (রাঃ) তাকে বিয়ে করেন। সা'দ (রাঃ) স্বীয় নিতম্ব ও দু'হাটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পাওয়ায় ক্বিদ্দীস ভবনের ছাদের উপর থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যখন সালমা দেখলেন যে, মুসলমান সৈন্যগণ আহত হচ্ছেন এবং ঘোড়াগুলো পশ্চাদপসরণ করছে, তখন বললেন, হায় মুছান্না! আজকে সেই মহাবীর মুছান্না আর নেই। অর্থাৎ মুছান্না থাকলে মুসলমানদের এ অবস্থা হ'ত না। এ কথা শুনে সা'দ (রাঃ) রেগে গিয়ে তাকে চপেটাঘাত করলেন। কারণ সা'দ (রাঃ) তো কাপুরুষতার জন্য ছাদে অবস্থান করছিলেন না! সালমা মূলতঃ তাঁকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। শুধু সালমা নয়, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী

৬৯. *ঐ, ৩/৫৪৩; ইবনু হাজার, আল-ইছাবা ৪/১৭৪।*
৭০. *ঐ ৩/৫৪৩; আল-কামিল ২/৩০৬-০৭; ইবনু খালদূন ২/৫৩৩।*
৭১. *ইবনু খালাদুন ২/৫৩৩; আল-কামিল ২/৩০৬।*
৭২. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৯/২৪০; তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৪৫-৫৪৭।*

Contents

সকল নারী এভাবে তাদের যোদ্ধাদের উৎসাহিত করছিল এবং আহতদের সেবা করছিল।[৭৩]

যুদ্ধের তৃতীয় দিন : 'আ'মাস' (اعماس)

এ দিনের নাম 'আ'মাস' (اعماس) বা কঠিন যুদ্ধ।[৭৪] এ নাম রাখার পিছনে কারণ হ'ল এ দিনটি উভয় দলের জন্য খুবই বিপজ্জনক ছিল। এ রাতকে বলা হয় 'হারীর' (هرير) তথা মিউমিউ করে কান্না অর্থাৎ আহতদের চিৎকারের রাত। আ'মাসের দিন মুসলমানগণ প্রথম যে কাজটি করেন তা হ'ল শহীদদের কাফন-দাফন সম্পন্ন করা এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পক্ষান্তরে পারসিক বাহিনীর নিহতরা দু'কাতারের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েই থাকল। আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলমানদের সম্মান ও পারসিকদের অপমান করলেন।[৭৫]

এদিকে কা'কা' ইবনু আমর কৌশল অবলম্বন করলেন এভাবে যে, তিনি কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে ময়দানের বাইরে অবস্থান নিলেন। সকাল হ'লে বেশ ক'টি একশ' জনের টিম তৈরী করে প্রত্যেক দলকে তাকবীর দিয়ে ময়দানে প্রবেশ করতে বললেন। একটির পর একটি টিম এভাবে তাকবীর দিয়ে প্রবেশ করতে থাকল। তাদের তাকবীর শুনে অন্য সৈন্যরাও তাকবীর দিতে লাগল। কা'কা'র ভাই আছেম একই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। হাশেম ইবনু উতবা সিরিয়া থেকে সাহায্য নিয়ে আসলে তিনিও কা'কা'র পদ্ধতি অনুসরণ করে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করলেন। এতে মুসলিম বাহিনীর মাঝে নতুন সাহায্য প্রাপ্তির আনন্দ জেগে উঠল এবং তারা নতুনভাবে উৎসাহিত হন।[৭৬]

এ দিনে পারসিক বাহিনী আবার হাতি নিয়ে ময়দানে প্রবেশ করল। তারা মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করে ফেলল। সা'দ (রাঃ) পারসিক নও মুসলিমদের নিকট হাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কৌশল জানতে চাইলেন। তারা বলল, এদের পরাস্ত করতে হ'লে তাদের চোখ ও শুঁড়ে আঘাত হানতে হবে। সা'দ (রাঃ) নির্দেশনা দিয়ে কা'কা' ও আছেম ইবনু আমরের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তাদের দু'জনকে বল, তারা যেন সাদা হাতির চোখে আঘাত হেনে তাকে পরাস্ত করে। আর হাম্মাল ও রুবাইবিল-এর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, তাদের দু'জনকে বল, তারা যেন আজরাব হাতিকে করতলগত করে। তারা সাদা হাতিকে হত্যা করতে সক্ষম হ'লেন এবং আজরাব হাতিকে করতলগত করলেন। এ অবস্থায় হাতিদ্বয় শূকরের মত চিৎকার শুরু করল এবং আজরাব হাতি পিছনে পলায়ন করে আতীক নদীতে ঝাঁপ দিল। এ দৃশ্য দেখে অন্যান্য হাতিগুলো তার অনুকরণ করে পারসিক বাহিনীর কাতার ভেদ করে আতীক নদী পাড়ি দিল। আর যারা এদের উপরে ছিল তারা সকলে নিহত হ'ল। অন্য বর্ণনায় আছে, কা'কা' ও আছেম পার্শ্বে আত্মগোপন করে থাকলেন এবং সুযোগ পেয়ে এক সাথে সাদা হাতির দু'চোখে বর্শা ঢুকিয়ে দিলেন। এতে হাতি তার মাথা নিচু করে ফেলল। আর তার চালকেরা নিচে পড়ে গেল। সুযোগ মত কা'কা' তার শুঁড় কেটে ফেললেন এবং চালকদের হত্যা করলেন।[৭৭]

হস্তিবাহিনী পলায়ন করলে মুসলিম সৈন্যরা পারসিক বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। তরবারীর মাধ্যমে এ দিন এত কঠিন এবং ভয়াবহ যুদ্ধ হ'ল যে, কাদেসিয়ার অন্য কোন দিনে এমনটা হয়নি। আ'মাসের দিনে দু'দল সৈন্যই কঠিন বিপদের মুহূর্তেও সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দেয়।[৭৮]

রাত হ'ল কিন্তু যুদ্ধ থামল না। দু'দলের সেনাপতিদের মাঝে কোন আলোচনাও হ'ল না। মুসলমানগণ এশার ছালাত আদায় করে অস্ত্র নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আহতদের কষ্ট জড়িত শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শুনা যাচ্ছিল না। এ রাতে মুসলমানগণ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করেন। ১. পদাতিক বাহিনী, যারা বর্শা ও তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। ২. তীরন্দায বাহিনী এবং ৩. অশ্বারোহী বাহিনী, যারা পদাতিক বাহিনীর সামনে থেকে যুদ্ধ করছিলেন।[৭৯]

এ রাতের যুদ্ধ সকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হ'ল। সা'দ (রাঃ) নিজ সৈন্যদের সংবাদ জানার আশায় এবং তাদের সার্বিক নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষায় সারা রাত ছালাত ও দো'আর মধ্যে অতিবাহিত করলেন।[৮০]

৪র্থ দিন : বিজয়

সকাল বেলার দিগন্ত বিস্তৃত আলোতে যুদ্ধের ময়দান স্পষ্ট হয়ে গেল। সেনাপতি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর চোখে যুদ্ধের ময়দান ভেসে উঠল। তিনি লক্ষ্য করলেন তারা সামনে অগ্রসর হয়েছে এবং তারা আনন্দে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন। তারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্তির দৃঢ় প্রত্যাশা করেছিলেন। ফলে এ রাতে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের দশ হাযার সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

কা'কা' ইবনু আমর (রাঃ) বিজয়ের প্রাক্কালে কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সৈন্যদের সামনে গিয়ে বললেন, কিছুক্ষণ পর আবার অবস্থার অবনতি হ'তে পারে। অতএব তোমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ কর এবং হামলা চালিয়ে যাও। কেননা ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা যায়। কা'কা'র বক্তব্য শুনে চৌকস সৈন্যদের একটি দল তাঁর পাশে সমবেত হ'ল। তারা রুস্তমের মূল বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল এবং তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'ল।

---

৭৩. *ঐ ৩/৫৭৫; আল-বিদায়াহ ৭/৪৪।*
৭৪. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ২/৬২৮।*
৭৫. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৫১।*
৭৬. *ঐ, ৩/৫৫২।*
৭৭. *ঐ, ৩/৫৫৫-৫৫৬; আল কামিল ২/৩৩৩।*
৭৮. *তারীখু ত্বাবারী ২/৫৫৭।*
৭৯. *ঐ, ৩/৫৫৯ ও ৫৬৪।*
৮০. *আল-কামিল ২/৩৩৪।*

হরমুযান ও বীরযান তাদের স্থান হ'তে অপসারিত হ'ল। মুসলমানগণ কাফিরদের মূল বাহিনীর উপর শাণিত হামলা চালালো। এরই মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় এসে রুস্তমের তাঁবুকে নদীতে নিক্ষেপ করল। কা'কা' ও তাঁর সাথীরা রুস্তমের আসনে গিয়ে আঘাত হানলেন। কিন্তু রুস্তম ঝড়ের সময় স্থান ত্যাগ করায় প্রাণে বেঁচে যান।[৮১]

এদিকে রুস্তম বোঝা ওয়ালা একটি গাধার পাশে আত্মগোপন করলেন। হিলাল বিন আলক্বামাহ তামীমী গাধাটির পাশে তাকে লুকিয়ে থাকতে দেখে ছুটে আসলেন তার দিকে। তাকে হামলা করতে গিয়ে হিলাল গাধার উপর থাকা বোঝা কেটে ফেলে দিলেন। বোঝার নিচে পড়ে রুস্তমের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। আত্মরক্ষার্থে রুস্তম আতীক নদীতে ঝাঁপ দিলেন। হেলাল নদীতে গিয়ে তার উপর হামলা করে তার পা ধরে নদীর কিনারায় নিয়ে আসলেন। অতঃপর তরবারী দিয়ে তার কপালে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন। এরপর হিলাল রুস্তমের সিংহাসনে আরোহণ করে চিৎকার দিয়ে বলা শুরু করলেন, কা'বার রবের কসম! আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি (قَتَلْتُ رُسْتُمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)।[৮২]

অন্যতম পারসিক সেনাপতি জালিয়ানুস তাদের প্রধান সেনাপতিকে নিহত হ'তে দেখে সৈন্যদের ময়দান ত্যাগ করে আতীক নদী পার হয়ে মাদায়েনের পথে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিল। কিন্তু তারা নদী পার হ'তে পারল না। মুসলিম সৈন্যরা বর্শা ও তীর দ্বারা তাদের কুপোকাত করতে লাগল। এভাবে তারা পারসিক বাহিনীর হাযার হাযার সৈন্যকে নদীতেই হত্যা করল।

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) যুহরাহ ইবনু হুওয়াই তামীমীর নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে জালিয়ানুসের বিরুদ্ধে পাঠালেন। যুহরা নদী তীরের সন্নিকটে তাকে পেয়ে হত্যা করলেন।[৮৩]

অবশিষ্ট পারসিক সৈন্যরা পলায়ন করে মাদায়েন থেকে সাহায্যের জন্য আগত সৈন্যদের সাথে মিলিত হ'ল। ঐ দলের সেনাপতি ছিলেন নুখারেজান। তিনি সকল সৈন্যকে ঐক্যবদ্ধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। নুখারেজান দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালে একজন মুসলিম সেনা যুহায়ের ইবনু সুলায়েম বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে নিমেষেই তাকে হত্যা করেন। এরপর মুসলিম বাহিনী দ্বিতীয় বারের মত পারসিকদের উপর হামলা করল। এতে তাদের কিছু সৈন্য নিহত হ'ল এবং কিছু পলায়ন করে রাজধানী মাদায়েনে গিয়ে আশ্রয় নিল।

যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

চার দিন ও তিন রাত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর কাদেসিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১. এ যুদ্ধকে যুগান্তকারী যুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়। মাত্র ছত্রিশ হাযার মুসলিম সৈন্য দুই লক্ষ সুসজ্জিত পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে।

২. এ যুদ্ধের ফলে অত্র অঞ্চল ইরাকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সকল বাধা দূরীভূত হয়। যুদ্ধের পর চার হাযার পারসিক সৈন্য সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন গোত্র ও ইরাকে বসবাসরত ধর্মযাজক দাহকানগণ দলে দলে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়।

৩. এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে পারস্যের রাজধানী মাদায়েন (১৬ হিজরীর ছফর মাসে) এবং জালাওলা ও হুলওয়ান (১৬ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে) বিজয়ের দার উন্মুক্ত হয়।[৮৪]

৪. খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ও মুছান্না ইবনু হারেছা কর্তৃক বিজিত ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা ইতিপূর্বে পারস্য নেতাদের প্ররোচনায় মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল। কিন্তু কাদেসিয়ায় বিজয়ের ফলে তারা নানা ওযর-আপত্তি পেশ করে মুসলমানদের কাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমানগণ তাদের ক্ষমা করে দেন। এভাবে পুরো ইরাকে শান্তি কায়েম হয়।[৮৫]

৫. কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানগণ বহু গণীমত লাভ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পারস্যের বড় পতাকা *(দারফাশ কাবিয়ান)*। এটি তারা নেকড়ে বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরী করেছিল। যার দৈর্ঘ্য বার হাত এবং প্রস্থ আট হাত। যার উপরে মণি-মুক্তা, ইয়াকূত পাথর ও জহরত দিয়ে নকশা করা ছিল।[৮৬]

উপসংহার :

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি হ'ল তাদের ঈমানী শক্তি। তারা ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করে বলেই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিশাল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। যুদ্ধ নয় শান্তিই মূলত ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ময়দানে গিয়েও তারা মুশরিকদের বার বার শান্তির প্রস্তাব দিয়েছেন। খায়বারের দিন রাসূল (ছাঃ) সেনাপতি আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'হে আলী! তুমি তাদেরকে প্রথমে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করবে। কেননা আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তাহ'লে সেটা তোমার জন্য লাল উট প্রাপ্তির চেয়েও উত্তম হবে'।[৮৭] আল্লাহ আমাদের সকলকে শান্তির পথে আহ্বান করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

৮১. *ডঃ মুহাম্মাদ সাইয়েদ ওয়াকীল, জাওলাতুন তারীখিয়্যাহ ফী আছরিল খুলাফায়ির রাশিদীন, পৃঃ ১২৮।*
৮২. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৬৪; আল-কামিল ২/৩১৩; তারীখু ইবনে খালদূন, ২/৫৩৫; আল-বিদায়াহ ৭/৪৬।*
৮৩. *তারীখু ত্বাবারী ৩/৫৬৫; আল-কামিল ২/২৫।*
৮৪. *ঐ, ৪/৫, ৭, ৮, ২৩ ও ২৪ পৃঃ।*
৮৫. *আল-বিদায়াহ ৭/৪৭।*
৮৬. *মাসঊদী, মুরূজুয যাহাব ২/৩২৮ ও ৪১৭।*
৮৭. *বুখারী হা/৩৭০১; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০।*

Contents

রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও পরিণাম

*লিলবর আল-বারাদী**

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন *(ছাফফাত ৩৭/৯, ফাতহ ৪৮/২৮)*। তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(সাবা ৩৪/২৮)*। তিনি বলেন, 'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি উপদেশদাতা বৈ কিছুই নও। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও' *(গাশিয়া ৮৩/২১-২২)*। আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন 'ইসলাম'কে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে রাসূল (ছাঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অমানুষিক নির্যাতন ও অকথ্য নিপীড়ন নীরবে সহ্য করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও এর পরিণতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হ'ল।-

রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র-মাধুর্য : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'অবশ্যই তুমি মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রফেসর সেডইউ বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন হাস্যমুখ ও মিশুক স্বভাবের। তিনি প্রায়ই নীরব থাকতেন এবং অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। অনর্থক কথা হ'তে তিনি দূরে থাকতেন এবং অশ্লীলতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন সঠিক মত ও উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।[৮৮]

অধিকাংশ নবী-রাসূল বিভিন্ন প্রকার মুজিযা লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি মানুষের অন্তরসমূহ পরিবর্তন এবং আত্মাকে পবিত্র করে দিতেন চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে। এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) লিখেছেন, 'কোন ব্যক্তি যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে এক বার আসত, সে ভীত হয়ে পড়ত। আর যে কেউ তাঁর পাশে এসে বসতো সে মহব্বতে আকৃষ্ট হয়ে যেত।[৮৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কাফেরদের নির্যাতন : রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কাফিরদের নির্যাতন ছিল দু'ধরনের। ১. মানসিক, ২. দৈহিক।

মানসিক নির্যাতন : কাফিররা পরিকল্পিতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নানা অপবাদ আরোপ করে মানসিকভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তাদের আরোপিত অপবাদসমূহ যেমন- (১) পাগল *(তূর ৫২/২৯)*, (২) কবি *(ছাফফাত ৩৭/৩৫-৩৬)*, (৩) জাদুকর ও (৪) মিথ্যাবাদী *(ছোয়াদ ৩৮/৪)*, (৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী (আনফাল ৮/৩১; ফুরক্বান-২৫/৫), (৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী *(ফুরক্বান-২৫/৪)*, (৭) মিথ্যা রটনাকারী *(নাহল-১৬/১০১; ফুরক্বান-২৫/৪)*, (৮) ভবিষ্যদ্বক্তা *(তূর ৫২/২৯)*, (৯) পথভ্রষ্ট *(তাত্বফীফ ৮৩/৩২)*, (১০) বেদ্বীন[৯০], (১১) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী ও (১২) জামা'আত বিভক্তকারী[৯১], (১৩) জাদুগ্রস্ত *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৭)*, (১৪) মুযাম্মাম (নিন্দিত)।[৯২] কুরায়েশরা রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিয়ে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলত।[৯৩] (১৫) 'রা'ইনা' *(বাক্বারা ২/১০৪)* প্রভৃতি।

এসব নির্যাতনের পরিণতিতে এরা দুনিয়াতে হেদায়াত বঞ্চিত হয় এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন, اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ, ওরা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা পথ পেতে পারে না' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৪৮)*।

দৈহিক নির্যাতন : উপরোক্ত মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি এরা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শারীরিক নির্যাতনও করত। নিম্নে কয়েকজনের নির্যাতন ও তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আবু লাহাব ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতন এবং পরিণতি :

রাসূল (ছাঃ) কম-বেশী সকল কাফির- মুশরিক নেতাদের পক্ষ থেকে নির্যাতিত হয়েছেন। তন্মধ্যে আবু লাহাব অন্যতম। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয্যা। সে ছিল আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। সে লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'আবু লাহাব' অর্থাৎ 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওয়ালা' বলা হ'ত। এছাড়া 'আব্দুল ওযযা' নাম কুরআনে থাকাটা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। বিধায় পবিত্র কুরআনে তার আসল নাম বর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল। তার পরেও সে নবী করীম (ছাঃ)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ নানা রকম নির্যাতন করত।

একদা নবী করীম (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আহ্বান জানালেন, হে বনু ফিহর! হে বনু আদী! এভাবে কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রকে। এতে সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হ'ল। যে পারেনি সে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল কি ব্যাপার জানার জন্য। কুরায়েশরা এসে হাযির হ'ল, আবু লাহাবও তাদের সাথে ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে শত্রুসৈন্য অবস্থান করছে। ওরা যেকোন সময় তোমাদের উপর হামলা করতে প্রস্তুত, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে

** যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

৮৮. কাযী সুলাইমান মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন, অনুবাদ: ড. মু. মুজীবুর রহমান (রাজশাহী : মুহাম্মদী প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৯৭), ১/২২৫ পৃঃ।

৮৯. রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২২৬ পৃঃ।

৯০. আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৭তম সংস্করণ ২০০৫ইং, পৃঃ ৮৬।

৯১. ঐ, পৃঃ ৯৫।

৯২. ঐ, পৃঃ ৮৭।

৯৩. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৭৮।

বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব। কারণ আপনাকে আমরা কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। আবু লাহাব বলল, তুমি ধ্বংস হও। একথা বলার জন্য তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছ? তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। যাতে বলা হয়, 'আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও'।[৯৪]

অন্যত্র আছে, ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-কে মারার জন্য আবু লাহাব একটি পাথরও তুলেছিল।[৯৫] তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুওয়াত পূর্বকালে রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু নবী হওয়ার পরে সে তার ছেলেদেরকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে এই দুই মেয়ের সাথেই একের পর এক ওছমান (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৯৬]

রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (উপনাম ত্বাইয়েব বা তাহের) মারা গেলে আবু লাহাব খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ এখন লেজকাটা নির্বংশ (الأبتــر) হয়ে গেল। যার প্রেক্ষিতে সূরা কাওছার নাযিল হয়।

হজ্জের মৌসুমে আবু লাহাব রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে লেগে থাকত। যেখানেই রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাঁকে গালি দিয়ে লোকদেরকে ভাগিয়ে দিত এবং বলত, إِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ فَــلاَ تُــصَدِّقُوْهُ 'এ লোকটি বিধর্মী মিথ্যাবাদী তোমরা এর কথা বিশ্বাস করো না'।[৯৭] এমনকি 'যুল মাজায' নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহ'লে সফলকাম হবে', তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে সে পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলের পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়।[৯৮] এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সে একের পর এক নির্যাতন অব্যাহত রাখে।

অবশেষে আবূ লাহাবের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াবী গযব নেমে আসে। আবু লাহাবের মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও জঘন্যভাবে হয়। বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে নির্জন জায়গায় ফেলে আসে। সেখানে ধুকে ধুকে তার মৃত্যু হয়। তার লাশটি পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করেনি। শেষ পর্যন্ত দেহ পঁচতে শুরু করলে গর্ত খুঁড়ে চাকর দ্বারা পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে হেঁচড়ে সে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়।[৯৯]

আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া (أروى) অথবা 'আওরা' (العوراء) ওরফে উম্মে জামীল অর্থাৎ সুন্দরের উৎস। সেও স্বামীর একান্ত সহযোগী ছিল এবং সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ও নিন্দাবাদে মুখর থাকত। চোগলখুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সংসারে বা সমাজে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে আরবদের পরিভাষায় حمالة الحطب বা খড়িবাহক বলা হ'ত। অর্থাৎ ঐ শুষ্ক কাঠ যাতে আগুন লাগালে দ্রুত আগুন বিস্তার করে। আবু লাহাবের স্ত্রী একাজটিই করত আড়ালে থেকে। সেকারণ আল্লাহ তাকেও স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। আবু লাহবের স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। সে রাসূল (ছাঃ)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার সম্মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখত। যাতে রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পান। এই মহিলা ছিল একজন কবি। সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলত। সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে পাথর খণ্ড নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা চত্বরে গমন করে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় রাসূল (ছাঃ) সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পায়নি। তাই পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসা মূলক কবিতা বলে ফিরে আসে। উক্ত কবিতায় সে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলে। যেমন مُذَمَّمًا عَصَيْنَا– وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا– وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا 'নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি। তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি। তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি'।[১০০] আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? জবাবে তিনি বললেন, না, দেখতে পায়নি। আল্লাহ আমার জন্য তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।[১০১]

রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন তখন বকরীর নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারত যে, সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়ত। আবার কখনও কখনও উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো হ'লে সে হাঁড়িতে নিক্ষেপ করত। রাসূল (ছাঃ) তাদের অত্যাচারে ঘরের ভিতরে নিরাপদে ছালাত আদায় করার জন্য একটি জায়গা করে নিয়েছিলেন।[১০২]

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলায় একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহন করে আনতে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেন এবং হালাক করে দেয়' *(কুরতুবী)*।

---

৯৪. বুখারী হা/৪৭৭০, ৪৮০১; মুসলিম হা/২০৮।

৯৫. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, ভাষান্তর: খাদিজা আখতার রেযায়ী (ঢাকা : আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯০), ১১০ পৃঃ।

৯৬. সায়্যিদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলাযিল কুর'আন, (মিশর: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী), ৩/২৮২পৃঃ।

৯৭. আহমাদ হা/১৬০৬৬, ১৬০৬৯, সনদ হাসান; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, সনদ ছহীহ।

৯৮. ছহীহ ইবনু হিববান, হাকেম ২/৬১১; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭, সনদ হাসান; তফসীরে কুরতুবী।

৯৯. আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৫২-২৫৩ পৃঃ।

১০০. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৭৮।

১০১. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৩৫-৩৩৬।

১০২. ইবনে হিশাম ১/৪১৬ পৃঃ।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটবর্তী হয়ে বলল, আমি وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ‘নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি *(নাজম ৫৩/১-২)* এই আয়াত দু’টিকে অস্বীকার করি বলে একটা হেঁচকা টানে রাসূল (ছাঃ)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে দিল এবং থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বদ দো‘আ করে বললেন, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ‘আল্লাহ তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও’। কিছুদিন পরে উতায়বা সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে ‘যারক্বা’ (الزرقاء) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘকে সে তাদের চারপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠল, هو والله يأكلني كما دعا محمد عليّ ‘আল্লাহ্‌র কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে দো‘আ করেছিল’। পরদিন সকালে বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ধরে নিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করল।[১০৩] এভাবে আবু লাহাব, তার স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল ও তাদের পুত্র উতায়বার নির্যাতনের প্রতিকার মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই কার্যকর হ’ল।

২. আবু জাহল কর্তৃক অত্যাচার ও পরিণতি : ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল আবু জাহল। তার মূল নাম আমর ইবনে হিশাম। জাহেলী যুগে তার উপাধি ছিল আবুল হাকাম। অর্থাৎ জ্ঞানের পিতা। তার আচরণের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাম রাখেন আবু জাহল অর্থাৎ মূর্খের পিতা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, কুরায়েশ সরদারদের নিকটে একদিন আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ আপনাদের সামনে নিজের চেহারায় ধূলো লাগিয়ে রাখে কি? কুরায়েশদের সরদাররা বলল, হ্যাঁ। আবু জাহল বলল, লাত ও ওয্যার শপথ! আমি যদি তাঁকে এ অবস্থায় দেখি, তবে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে দেব, তাঁর চেহারা মাটিতে হেঁচড়াব। এরপর রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখে তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য সে অগ্রসর হ’ল। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখল যে, আবু জাহল চিৎপটাং হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করছে এবং চিৎকার করে বলছে বাঁচাও বাঁচাও। তার পরিচিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখলাম, আমার ও মুহাম্মাদের মধ্যখানে আগুনের একটি পরিখা। ভয়াবহ সে আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাসূল (ছাঃ) এ কথা শুনে বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তবে ফেরেশতা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলত’।[১০৪]

একবার আবু জাহল বলল, হে কুরায়েশ ভাইয়েরা! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা ও উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না? আমাদের পিতা ও পিতামহকে সারাক্ষণ গালমন্দ করেই চলেছে। এ কারণে আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি একটি ভারী পাথর নিয়ে বসে থাকব, মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে, তখন সে পাথর দিয়ে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হ’লে তোমরা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখবে, ইচ্ছে হ’লে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এরপর আবদে মানাফ আমার সাথে যেরূপ ইচ্ছে ব্যবহার করবে এতে আমার কোন পরোয়া নেই। কুরায়েশরা প্রস্তাব শুনার পর বলল, কোন্ ব্যাপারে আমরা তোমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছি? তোমাকে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তুমি যা করতে চাও করতে পার। সকালে আবু জাহল একটি ভারী পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। কুরায়েশরা একে একে সমবেত হয়ে আবু জাহলের তৎপরতা দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল। রাসূল (ছাঃ) যথারীতি হাযির হয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন আবু জাহল পাথর নিয়ে অগ্রসর হ’ল। কিন্তু পরক্ষণে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এলো। তার হাত যেন পাথরের সাথে আটকে রইল। কুরায়েশদের কয়েকজন লোক তার কাছে এসে বলল, আবুল হাকাম! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি যে কথা রাতে বলেছিলাম, তা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পৌঁছাতেই দেখতে পেলাম, মুহাম্মাদ এবং আমার মাঝখানে একটা উট এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! অত বড় লম্বা ঘাঁড় ও দাঁতবিশিষ্ট উট আমি কখনো দেখিনি। উটটি আমাকে হামলা করতে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, উটের ছদ্মবেশে ছিলেন জিবরীল (আঃ)। আবু জাহল যদি কাছে আসত, তবে তাকে পাকড়াও করা হ’ত।[১০৫]

আবু জাহল একদিন ছাফা পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালমন্দ করে ও শাসিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) নীরব রইলেন, কোন কথা বললেন না। এরপর আবু জাহল নবী করীম (ছাঃ)-এর মাথায় এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করল। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বের হ’ল। এরপর আবু জাহল কা‘বার সামনে কুরায়েশদের মজলিসে গিয়ে বসল। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ‘আনের একজন দাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। ইতিমধ্যে হামযাহ শিকার করে ফিরছিলেন। সেই দাসী তাকে ঘটনা শুনালেন। হামযাহ ঘটনা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন কুরায়েশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তিনি দেরী না করে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আবু জাহলকে যেখানে পাব সেখানেই আঘাত করব। এরপর তিনি সোজা কা‘বা ঘরে আবু জাহলের সামনে গিয়ে বললেন, ওরে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগকারী! তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছিস, অথচ আমিও তাঁর প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী?[১০৬] এ কথা বলে হাতের ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, মাথায়

---

১০৩. শায়খ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ, মুখতাছার সীরাতে রাসূল, ১/১৩৫ পৃঃ।
১০৪. মুসলিম হা/২৭৯৭; মিশকাত হা/৫৮৫৬।
১০৫. ইবনে হিশাম ১/২৯৮-২৯৯ পৃঃ।
১০৬. নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শেষ দিকে যিলহজ্জ মাসে হামযাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

বড় ধরনের জখম হয়ে গেল। এ ঘটনার সাথে সাথে আবু জাহলের গোত্র বনু মাখযূম এবং হামযাহ (রাঃ)-এর গোত্র বনু হাশেমের লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠলো। আবু জাহল সকলকে এই বলে থামিয়ে দিল যে, আবু আমরকে কিছু বল না, আমি তার ভাতিজাকে আসলেই খুব খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছিলাম।[১০৭]

ইয়াসির বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র মুসলমান হন। ফলে তাঁদের উপরে যে ধরনের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। আবু জাহলের নির্দেশে বনু মাখযূমের এই ক্রীতদাস মুসলিম পরিবারের উপরে নৃশংসতম শাস্তি নেমে আসে। তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে ফেলে রেখে নানাভাবে নির্যাতন করা হ'ত। একদিন চলার পথে তাদের এই শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, صبرًا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। ইয়াসিরের দুই পায়ে দু'টি রশি বেঁধে দু'দিকে দু'টি উটের পায়ে উক্ত রশির অন্য প্রান্ত বেঁধে দিয়ে উট দু'টিকে দু'দিকে জোরে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়। তাতে জোরে হেঁচকা টানে ইয়াসিরের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি শাহাদতবরণ করেন।[১০৮]

অতঃপর পাষাণ হৃদয় আবু জাহল নিজ হাতে ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ। অতঃপর তাদের একমাত্র পুত্র আম্মারের উপরে শুরু হয় অবর্ণনীয় নির্যাতনের পালা। তাকে উত্তপ্ত কংকরময় বালুর উপরে হাত, পা বেঁধে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রেখে নির্যাতন করা হয়। একদিন আম্মারকে পানিতে চুবিয়ে আধামরা অবস্থায় উঠিয়ে বলা হ'ল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদকে গালি না দিবে এবং লাত, মানাত ও উযযা দেব-দেবীর প্রশংসা না করবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন।

পরেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে কান্না-জড়িত কণ্ঠে সব ঘটনা খুলে বললেন ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ- 'ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার জন্য কোন চিন্তা নেই)' *(নাহল ১৬/১০৬)*। পরে আবুবকর (রাঃ) আম্মার বিন ইয়াসিরকে তার মনিবের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। আম্মার ঐ সময় আবুবকর (রাঃ)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেন, তার শুরু ছিল নিম্নরূপ :

جزى الله خيرا عن بلال وصحبه + عتيقا وأخزى فاكها وابا جهل

'আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন আবুবকর (রাঃ)-কে বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ'তে এবং লাঞ্ছিত করুন আবু ফাকীহাহ ও আবু জাহলকে'।[১০৯]

রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করার পরিণাম বদর প্রান্তরে এমন ভয়াবহ হবে আবু জাহল তা ভাবতে পারেনি। দুর্বৃত্ত নেতার চারিদিকে ছিল তীর ও তলোয়ার বাহিনীর পাহারা। মুসলিম মুজাহিদের প্রচণ্ড হামলায় সেই পাহারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানরা লক্ষ্য করলেন যে, আবু জাহল একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহী। তার মৃত্যু তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে আমি মুসলমানদের কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন আনছার কিশোর। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ একজন চুপিসারে বলল, চাচাজান আবু জাহল কে? আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, তুমি তার কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নবী করীম (ছাঃ)-কে গালি দিয়ে কষ্ট দেয়। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকে ততক্ষণ আমি তার সাথে লড়াই করে যাব। বর্ণনাকারী (আব্দুর রহমান বিন আওফ) একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অন্য আনছার কিশোরও চুপিসারে একই কথা বলল। কয়েক মহূর্ত পরে আমি আবু জাহলকে লোকদের মাঝে বিচরণ করতে দেখলাম। আমি আনছার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ঐ দেখো তোমাদের শিকার। এ কথা শুনামাত্র উভয়ে আবু জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল।

এরপর তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে উপস্থিত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছ? উভয়ে বলল, আমি হত্যা করেছি। তিনি (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। নবী করীম (ছাঃ) তাদের তলোয়ার দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই হত্যা করেছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু জাহলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহকে প্রদান করলেন। তাদের একজনের নাম ছিল মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ ও অপরজনের নাম মু'আব্বিয ইবনে আফরা।[১১০]

এরপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, চলো আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে আবু জাহলের লাশের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এ হচ্ছে এই উম্মাতের ফেরাউন।[১১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু জাহল, ওতবা ইবনে রাবী'আ, শায়বা ইবনে রাবী'আ, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালাফ

১০৭. রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৫৩ পৃঃ; ইবনে হিশাম ১/২৯১-২৯২ পৃঃ।
১০৮. ইবনে হিশাম ১/৩২০ পৃঃ।

১০৯. সুবুলুল হুদা, ২/৩৬২; সীরাতে ইবনে ইসহাক ১/১৯১।
১১০. মুসলিম হা/১৭৫২; মিশকাত হা/৪০২৮।
১১১. আর-রাহীকুল মাখতূম ২৪৭ পৃঃ।

এবং উকবা ইবনে আবু মুঈত্বসহ অন্যান্য কাফেরের নাম ধরে ধরে বদদো'আ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহর পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার নির্দেশে ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে শত্রুরা দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই সময় কিভাবে এই দুঃসংবাদ ফাতেমার কানে পৌঁছল। তিনি দৌঁড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে কষ্টকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন,

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ.

'হে আল্লাহ! তুমি কুরায়েশকে ধরো (তিনবার)! হে আল্লাহ! তুমি আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহলকে ধরো। হে আল্লাহ! তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, ওয়ালীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্বা বিন আবী মু'ঈত্ব এবং ওমারাহ বিন অলীদকে ধরো'। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি'।[১১২]

৩. খালাফের পুত্রদ্বয়ের কটূক্তি ও নিপীড়ন : উমাইয়া ও উবাই ছিল খালাফের পুত্র। তারা নানাভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কষ্ট দিত। উমাইয়ার অভ্যাস ছিল যে, যখন রাসূল (ছাঃ)-কে দেখত, তখনই কটূক্তি করত, তাঁকে অভিশাপ দিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যক ঐ ব্যক্তির, যে সামনে ও পিছনে লোকের নিন্দা করে' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*। ইবনে হিশাম বলেন, হুমাযা সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালাগালি করে এবং পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে এবং কষ্ট দেয়।[১১৩]

উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন বেলাল (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া বেলালের গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার উচ্ছৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দিত। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত। এরকম করার ফলে তাঁর গলায় দড়ির দাগ পড়ে যেত। উমাইয়া নিজে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করত। এরপর উত্তপ্ত বালুর উপর জোর করে শুইয়ে রাখত। এ সময়ে তাঁকে অনাহারে রাখা হ'ত। এমনকি কখনো কখনো তাঁকে দুপুরের তীব্র রোদে মরু বালুকার উপর শুইয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাঁপা দিয়ে রাখত।[১১৪]

একবার সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) মক্কায় উমাইয়া ইবনে খালাফকে বলেছিলেন, হে উমাইয়া! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে। একথা শুনে উমাইয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এ ভয় তার সব সময় ছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনও মক্কার বাইরে যাবে না। আবু জাহলের পীড়াপীড়িতে উমাইয়া বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সবচেয়ে দ্রুতগামী উট ক্রয় করে। যাতে করে বিপদের সময় খুব দ্রুত পালিয়ে আসতে পারে। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে বলছিল, আবু ছাফয়ান! আপনার ইয়াছরেবী ভাই যে কথা বলেছিলেন, আপনি কি সে কথা ভুলে গেছেন? সে বলল, না ভুলিনি, আমি তো ওদের সাথে কিছুদূর যাব।[১১৫]

মক্কায় জাহেলী যুগ থেকেই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও উমাইয়া ইবনে খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বদর যুদ্ধের দিনে উমাইয়া তার সন্তান আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কয়েকটি বর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে উমাইয়া বলল, আমি কি তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারি? তোমার বর্মগুলোর চেয়ে আমরা উত্তম। আজকের মত দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেই?[১১৬] এ কথা শুনে আব্দুর রহমান বর্মগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং উমাইয়া ও তার পুত্রকে বন্দী করে সামনের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বেলাল (রাঃ) উমাইয়াকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে দেখে বললেন, ওহে কাফেরদের সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ! হয় আমি বেঁচে থাকব নতুবা তুমি বেঁচে থাকবে। এরপর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ওহে আনছাররা! এই দেখো কাফেরদের সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ, এবার হয় আমি থাকব নতুবা সে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, ততক্ষণে লোকেরা আমাদেরকে ঘিরে ফেললেন। আমি তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু একজন ছাহাবী তলোয়ার তুলে উমাইয়ার পুত্র আলীর পায়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সে ঢলে পড়ল। এদিকে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে যে, আমি এত বিকট শব্দ কখনও শুনিনি। আমি বললাম, পালাও পালাও। কিন্তু আজতো পালানোর পথ নেই। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমার কোন উপকারে আসতে পারব না। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, উত্তেজিত ছাহাবাগণ উমাইয়া ও তার পুত্র আলীকে ঘিরে ফেলে আঘাতে আঘাতে হত্যা করে ফেলল।[১১৭]

উবাই ইবনে খালাফ উমাইয়ার ভাই। উকবা ইবনে আবু মুঈত্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। উকবা উবাইয়ের কথা মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। উবাই বিন খালাফ নিজে একবার মরা-পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রাসূল (ছাঃ)-

১১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৭; 'রাসূলের আবির্ভাব ও অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।*
১১৩. *ইবনে হিশাম ১/৩৫৬-৩৫৭ পৃঃ।*
১১৪. *রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৪৫ পৃঃ।*
১১৫. *বুখারী ২/৫৬৩, আর-রাহীকুল মাখতূম ১৪৮ পৃঃ।*
১১৬. *যে ব্যক্তি আমাকে বন্দী করবে মুক্তিপণ হিসাবে আমি তাকে অনেক দুধেল উটনী দেব।*
১১৭. *আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৪৯ পৃঃ।*

Contents

এর কাছে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যাতে তাঁর মুখ ভর্তি হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম হয়।[১১৮] সে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে দেখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত এবং হত্যার হুমকিও দিত। নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় থাকাকালে দেখা হ'লে সে গর্বভরে বলত, 'হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে 'আওদ' নামের একটি ঘোড়া রয়েছে; ওকে আমি প্রতিদিন তিন ছা' (সাড়ে সাত কিলোগ্রাম) খাবার খাওয়াচ্ছি। সেই ঘোড়ার পিঠে বসে একদিন আপনাকে হত্যা করব। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলতেন, উল্টাও হ'তে পারে। ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব।[১১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদের যুদ্ধে ময়দানে পৌঁছার পর উবাই ইবনে খালাফ একথা বলে সামনে অগ্রসর হ'ল যে, মুহাম্মাদ কোথায়? হয়ত আমি থাকব নতুবা তিনি থাকবেন। ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ওকে আসতে দাও। এই দুর্বৃত্ত কাছে এলে রাসূল (ছাঃ) হারেছ ইবনে সাম্মার (রাঃ) নিকট থেকে ছোট একটি বর্শা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা ছিল ঠিক তেমনি, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটুখানি ঝাঁকুনি দেয়, এতে মাছি উড়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) এরপর উবাইয়ের মুখোমুখি হ'লেন, ইবনে খালাফের শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝামাঝি একটুখানি জায়গা (গলার কাছে) খালি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) সেই স্থান লক্ষ্য করে হাতের বর্শা নিক্ষেপ করলেন।

১১৮. ইবনে হিশাম, ১/৩৬১-৩৬২ পৃঃ।
১১৯. আর-রাহীকুল মাখতূম, ৪৮ নং টিকা, ৩০৪ পৃঃ।

এতে উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল এবং তার মিত্রদের কাছে ফিরে গেল। তার গলার কাছে সামান্য কেটে গিয়েছিল বটে, কিন্তু রক্ত বের হয়নি। আঘাতও তেমন ছিল না। তবুও সে চিৎকার করে বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছেন। লোকেরা তাকে বলল, কি বাজে বকছ? তোমার আঘাত তো তেমন গুরুতর নয়। গলায় সামান্য আঁচড় লাগার মত দেখা যাচ্ছে। উবাই বলল, তিনি মক্কায় আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করব। কাজেই আল্লাহ্‌র শপথ! আমার প্রাণ চলে যাবে।[১২০]

সে গাভীর মত চিৎকার করে বলত, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করছি, সেই কষ্ট-যন্ত্রণা যদি যিল-মাযাযের অধিবাসীরা অনুভব করত, তাহ'লে তারা সবাই মারা যেত।[১২১] অন্যত্র আছে, সে বারবার বলছিল, মুহাম্মাদ মক্কায় বলছিলেন, আমিই তোমাকে হত্যা করব। তিনি যদি আমাকে থুথুও নিক্ষেপ করতেন, তবুও আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত।[১২২]

অবশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু উবাই ইবনে খালাফ মক্কায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে মারা যায়।[১২৩]

[চলবে]

১২০. যাদুল মা'আদ, ২/০৭ পৃঃ।
১২১. মুখতাছার সীরাতুর রাসূল, ২৫০ পৃঃ।
১২২. আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৪৭ পৃঃ।
১২৩. ইবনে হিশাম, ২/৮৪ পৃঃ।

রক্তাক্ত পেশোয়ার : চরমপন্থার ভয়াল রূপ

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

গত ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি স্কুলে ঘটে গেল নারকীয় হত্যাকাণ্ড। যা সন্ত্রাসপ্রবণ পাকিস্তানের ইতিহাসে এক নযীরবিহীন ঘটনা। জঙ্গী হামলা এ দেশে এমন এক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে তেমন কোন বিকার দেখা যায় না; অথচ সেই পাকিস্তানে আজ সমগ্র জাতি শোকে মুহ্যমান। কেউই মেনে নিতে পারছে না এক সাথে এতগুলো শিশু-কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু। ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে এমন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা কি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে সম্ভব? কেন এই নিরপরাধ শিক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করা হ'ল? এই প্রশ্ন আজ সবার মুখে মুখে। তালেবানদের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল ছিল, তারাও এ ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেছে। এমনকি আফগানিস্তানের তালেবানরাও ইতিমধ্যে এর নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। বর্বরতার সমস্ত সীমা ছাড়ানো এই মর্মান্তিক হামলায় নিহত হয়েছে ১৪৫ জন। এর মধ্যে ১৩২ জনই ছিল শিক্ষার্থী, যাদের বয়স ৮ থেকে ১৮ বছর। খবরে বলা হয়েছে, এই হামলায় স্কুলটির নবম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত ব্যতীত সকলেই নিহত হয়েছে।

এ ঘটনার মাত্র একদিন পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক শিক্ষা সফরের সুবাদে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সোয়াত ভ্যালিতে। ২০০৭ থেকে ২০০৯-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত তালেবানদের দখলে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ সোয়াত উপত্যকা। এ সময় তারা নারী শিক্ষা এবং পশ্চিমা শিক্ষা বন্ধ করার নামে প্রায় ২০০টি স্কুল ধ্বংস করেছিল। ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল বহু সরকারী স্থাপনা। তাদের হাতে নিহত হয়েছিল কয়েক হাযার মানুষ। পরে দীর্ঘ অভিযান চালিয়ে সরকার ২০১২ সালে এসে সেখানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তালেবানদের বিদায়ের ৫ বছর পর এখন সেখানকার জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যদিও পথে পথে প্রচুর আর্মি চেকপোস্ট পার হ'তে হয়। তালেবানদের স্কুল বন্ধ করার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেখানে এখন শিক্ষা-দীক্ষায় এক নতুন জোয়ার এসেছে। মিঙ্গোরা থেকে মালাম জাব্বার পথে দুর্গম পাহাড়ী এলাকাতেও দেখলাম ফুটফুটে সুন্দর ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা বই হাতে নিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ এমনিতেই অনেক সুন্দর, তার উপর স্কুল ড্রেস পরা বাচ্চাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল। রাস্তার ধারে অনেক জায়গায় দেখলাম নবনির্মিত সরকারী স্কুল। তালেবান আমলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্কুলগুলোর উপর নতুন করে এ স্কুলগুলো তৈরী করা হয়েছে। মালাম জাব্বা স্কী রিসোর্টে পৌঁছে মনে হ'ল কোন পরিত্যক্ত জায়গায় এসে পড়েছি। জানতে পারলাম একসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই স্থানটি পর্যটক মুখরিত থাকত। কিন্তু ২০০৮ সালে এখানকার বিশাল সরকারী রেস্ট হাউজটি তালেবানরা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে পর্যটক আসা প্রায় বন্ধ। ধ্বংসের চিহ্নগুলো দেখে একটা কথাই মনে হচ্ছিল যে, তালেবানরা এত ধ্বংসাত্মক বর্বর হয় কিভাবে? এরা কি আসলেই মুসলমান? তারও উপরে এরা কি আসলে মানুষ? সরকারের সাথে বিরোধ কিংবা পশ্চিমা শিক্ষা বা নারী শিক্ষার সাথে বিরোধ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ইট-পাথরের স্থাপনাগুলো ধ্বংস করার মধ্যে কী এমন যুক্তি রয়েছে? ভবনগুলো তো অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেত! বিশ্বাস করতে মন একেবারেই সায় দেয় না যে একজন মুসলমান যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান আছে, তার দ্বারা এমন বিবেকশূন্য কাজ হ'তে পারে!

সেখান থেকে ফেরার পর একদিন পার না হ'তেই পেশোয়ারের এই ঘৃণ্যতম শিশুহত্যার ঘটনা শুনতে হ'ল। খবরটি জানার পর একদম বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু মনে পড়ছিল একদিন আগেই দেখা সোয়াত শিশুদের ফুটফুটে চেহারা। একই প্রশ্ন বার বার মনে ভাসছিল...কোন মুসলমানের পক্ষে কি সম্ভব এই জঘন্যতম কাজ করা? কিভাবে সম্ভব? এই বিবেকহীন খারেজী অমানুষরা নিরীহ নিরপরাধ মানুষের আর কত রক্তপাত ঘটাবে?

তালেবান অপতৎপরতার শুরু

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তালেবানদের এই ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপট খুঁজতে গেলে পাকিস্তান সরকারের মার্কিন তোষণ নীতিই সর্বাগ্রে চলে আসে। ২০০১ সালের পর আমেরিকার কথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে' যোগ দেয় পাকিস্তান। সেই যুদ্ধের অংশ হিসাবে আল-কায়েদা দমনের অজুহাতে ওয়াযীরিস্তানে পাকিস্তানী সেনার উপস্থিতি এবং সরকারী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তালেবানরা মেনে নিতে পারেনি। তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতার শুরু সেখান থেকেই। এছাড়া আদর্শিক চরমপন্থার বিষয়টি তো আছেই। এরপর ২০০৬ সালে মার্কিন ড্রোন হামলা এবং বিশেষ করে ২০০৭ সালে পারভেজ মোশাররফ সরকারের আমলে ইসলামাবাদের লাল মসজিদে সেনাবাহিনীর অভিযান বারুদের মত উস্কে দেয় জঙ্গীবাদ। যা বিস্তৃত হ'তে হ'তে দেশটিকে আজ এক ব্যর্থ রাষ্ট্রের কাতারে ফেলে দিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আত্মঘাতী বোমা হামলা, বন্দুক যুদ্ধ এবং দূর নিয়ন্ত্রিত বোমার মাধ্যমে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে কয়েক সহস্র জঙ্গীবাদী হামলা হয়েছে। যার শিকার হয়ে নিহত হয়েছে প্রায় ৩৫০০০ মানুষ। এর মধ্যে প্রায় ৫০০০ হ'ল আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, আর বাকিরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাসহ সাধারণ মানুষ। এছাড়া আহত হয়েছে কয়েক লক্ষ। এসব হামলা সবই যে কেবল তালেবান করেছে তা নয়, বরং রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়েছে বালুচ স্বাধীনতাকামী

* *এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

এবং শীআ-সুন্নী-আহমাদিয়া ইত্যাদি ধর্মীয় বিভক্তিতে ফায়দা উঠানো গোষ্ঠীগুলোও।

নব্বইয়ের দশকে আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থানে বিরাট ভূমিকা ছিল পাক সরকারের। কিন্তু ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানদের উপর মার্কিন হামলা শুরু হলে মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তারা হঠাৎ তালেবান বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এসময়ে মার্কিন আক্রমণে পিছু হটে আসা তালেবান ও আল-কায়েদা সদস্যরা দলে দলে আশ্রয় নিতে থাকে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গোত্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্যএশিয়া থেকে আগত যোদ্ধা। পরবর্তীতে তারা সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানের মাটি থেকে আফগানিস্তানের বিভিন্ন মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে যখন হামলা চালানো শুরু করল, তখন মার্কিন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক পাকিস্তান সরকার এই সকল যোদ্ধাদের দমন করার জন্য পদক্ষেপ নেয় এবং ২০০৩ সালে সেখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৫৫ বছরের ইতিহাসে এই আধা-স্বায়ত্বশাসিত উপজাতি এলাকায় এটাই ছিল পাক সেনাবাহিনীর প্রথম প্রবেশ। ৮০ হাযার নিয়মিত সেনা এই অভিযানে অংশ নেয়। স্বভাবতই তালেবানরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েক দফা তালেবানদের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে এই মর্মে যে, তারা পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে আফগানিস্তানে আর হামলা চালাবে না। বিনিময়ে পাকিস্তান সরকার সেনা অভিযান বন্ধ করে এবং বহু তালেবান কারাবন্দীকে মুক্তি দেয়। পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয়, পাকিস্তান সরকার তাদেরকে কেবল আফগানিস্তানে হামলা চালানো থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একটি সশস্ত্র গ্রুপ হিসাবে তারা টিকে থাকুক তাতে সরকারের আপত্তি ছিল না। কেননা তারা তাদের ভারত নীতি এবং আফগান নীতির সুরক্ষায় তালেবানদেরকে 'প্রক্সি যোদ্ধা' হিসাবে হাতে রাখতে চেয়েছিল। ঠিক যেভাবে নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে মুজাহিদদের 'প্রক্সি যোদ্ধা' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কিন্তু এই চুক্তি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ২০০৬ সালের অক্টোবরে বাজোড় এজেন্সিতে 'তাহরীকে নেফাযে শরীআতে মুহাম্মাদী' পরিচালিত একটি মাদরাসায় জঙ্গী দমনের অজুহাতে পাক সেনাবাহিনী রাতের আঁধারে বিমান হামলা চালালে ৮৬ জন মাদরাসা ছাত্র নিহত হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনা স্বভাবতই তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং তালেবানের সাথে পাকিস্তান সরকারের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফলে তাদের আফগানিস্তানমুখী বন্দুকের নল এবার সরাসরি পাকিস্তানের দিকে ঘুরে যায়। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে পাক সেনাবাহিনীর এই ঘৃণ্য পদক্ষেপই পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তালেবানদের জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটায়। সমগ্র দেশও এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তালেবানদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে।

এরপর ২০০৭ সালে 'তেহরীকে তালেবান পাকিস্তান' (টিটিপি) নামে তারা সাংগঠনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দলটির আমীর নির্বাচিত হন বায়তুল্লাহ মেহসূদ। সীমান্তবর্তী উপজাতীয় এজেন্সিগুলোর প্রতিনিধি এবং ছোট ছোট ১৩টি গ্রুপ নিয়ে দলটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, এই দলটির উত্থানে আফগান তালেবানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রাথমিকভাবে উপজাতীয় পশতুন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অধিবাসীরা তালেবানদেরকে ধর্মীয় আবেগ থেকে আশ্রয় দিলেও গোল বাঁধে যখন তালেবানরা উপজাতীয় এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য প্রায় ২০০ গোত্রীয় নেতাকে হত্যা করে। ফলে দ্রুত তারা জনসমর্থন হারাতে থাকে। তবে ব্যাপকভাবে আমেরিকার ড্রোন হামলা শুরু হওয়ার পর বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাতে থাকলে তালেবানরা আবার সমর্থন ফিরে পায়।

ইত্যবসরে সোয়াতে 'তেহরীকে নেফাযে শরীআতে মুহাম্মাদী' (টিএনএসএম)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছূফী মুহাম্মাদের জামাই মোল্লা ফযলুল্লাহ্র নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ সোয়াত উপত্যকার ৫৯টি গ্রাম দখল করে নেয় এবং শারঈ আদালত প্রতিষ্ঠা করে। ফযলুল্লাহ নেতৃত্বাধীন এই গ্রুপটি প্রথমে তালেবানদের সাথে যুক্ত ছিল না। ২০০৭ সালে 'তেহরীকে তালেবান পাকিস্তান' (টিটিপি) গঠিত হ'লে তারা দলটিতে কোয়ালিশন গ্রুপ হিসাবে যুক্ত হয়। অনেকের ধারণা, পাকিস্তানী আর্মি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে সোয়াতে ঢোকার সুযোগ দিয়েছিল। কারণ আমেরিকা চীনের উপর নজরদারির জন্য সোয়াত ভ্যালিতে একটি ঘাঁটি গাড়তে চাচ্ছিল। আমেরিকার স্বার্থে সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত থাকলেও পাকিস্তান সরকার চায়নি বন্ধু দেশ চীনের উপর আমেরিকা নজরদারী করুক। এজন্য জঙ্গী পাঠিয়ে সোয়াত উপত্যকা অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে কৌশলে আমেরিকার আকাংখাকে মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল সরকার। যা হোক ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত টিটিপি সেখানে ভয়, আতংক ও বিশৃংখলার রাজত্ব গড়ে তোলে। ফলে কখনই তারা জনসমর্থন লাভ করতে পারেনি। অবশেষে পাক সেনাবাহিনী তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে এবং মোল্লা ফযলুল্লাহ আফগানিস্তানে পালিয়ে যান। ২০১৩ সালে টিটিপি নেতা হাকীমুল্লাহ মেহসূদ নিহত হলে মোল্লা ফযলুল্লাহ টিটিপি'র মূল নেতৃত্বে আসেন। ধারণা করা হচ্ছে যে, তার নির্দেশনাতেই পেশোয়ারে ১৬ ডিসেম্বর'১৪-এর নারকীয় হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়।

এদিকে তালেবান দমনে কেবল পাকিস্তান সরকারের উপর আস্থাশীল না হয়ে আমেরিকা নিজেই টিটিপি নির্মূলের জন্য ড্রোন হামলা শুরু করে। ২০০৭-০৮ সালে এই হামলা আরো বিস্তৃত হয়। তবে এতে টিটিপি'র যোদ্ধাদের চেয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষই মারা পড়তে থাকে বেশী।[১২৪] ফলে সারা পাকিস্ত

---

১২৪. লণ্ডনের একটি সংস্থার তৈরী করা পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সালের শুরু পর্যন্ত পাকিস্তানে মোট ৩৮১ বার ড্রোন হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। যাতে নিহত হয়েছে প্রায় ৪ হাযার মানুষ। এদের মধ্যে মাত্র ৮৪ জন তালেবান বা আল-কায়েদা সদস্য হিসাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর বাকি সবাই সাধারণ নিরীহ মানুষ, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সহস্রাধিক নারী ও শিশুও *(ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেট জার্নালিজম, লণ্ডন)*।

ান জুড়ে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে। পাকিস্তান সরকার বাহ্যত 'দেশের সার্বভৌমত্ব লংঘনে'র অভিযোগ তুলে এই ড্রোন হামলার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেও ভিতরে ভিতরে সমর্থনই যোগাতে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এরই মধ্যে ২০০৮ সালে পাকিস্তান সরকার তালেবান (টিটিপি)-কে নিষিদ্ধ করে এবং তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফত করে। ফলে নিষিদ্ধ টিটিপি আরো সহিংস হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সেনা লক্ষ্যবস্তুসহ হাটে-বাযারে-মসজিদে যত্র যত্র আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে সারাদেশ অস্থিতিশীল করে তোলে। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাদের পাবলিক প্লেসে বোমা হামলা চালিয়ে শত শত নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা। যার সর্বশেষ সংযোজন হ'ল পেশোয়ারের এই হত্যাকাণ্ড। নিরপরাধ মানুষ হত্যার এই ঘৃণ্য নীতির কারণে তালেবানদেরই কতিপয় গ্রুপ ইতিমধ্যে টিটিপি ত্যাগ করেছে।

২০১৩ সালের জুনে নাওয়াজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর টিটিপি'কে নিয়ন্ত্রণ করতে সামরিক অভিযানের পরিবর্তে আবার শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করেন। সকল রাজনৈতিক দল এই শান্তি প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ বছরের শুরুতে রাজধানী ইসলামাবাদে বেশ কয়েকবার আলোচনা বৈঠকও হয়। কিন্তু তালেবানদের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে এই শান্তি প্রচেষ্টা সামনে এগুতে পারছিল না। এই প্রক্রিয়া চলমান থাকাকালেই ৮ই জুন ২০১৪ করাচী বিমানবন্দরে ভয়াবহ হামলা চালায় টিটিপি সংশ্লিষ্ট উজবেক জঙ্গী গ্রুপ। ফলে শান্তি আলোচনা আবারও ভেঙ্গে যায়। উপায়ান্তর না দেখে নাওয়াজ সরকার এক সপ্তাহ পরই ১৫ জুন ওয়াযীরিস্তানের তালেবান ঘাটিগুলো ধ্বংসের জন্য সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। অপারেশন 'যারব-ই-আযাব' নামক এই অভিযান অদ্যাবধি চলছে। সেনা ভাষ্যমতে, এই অভিযানে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে প্রায় ১৭০০ তালেবান সদস্য। মানবাধিকার সংস্থাগুলির অভিযোগ, সেনাবাহিনী সেখানে অভিযানের নামে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন করছে এবং বহু সাধারণ মানুষ তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণে যতটুকু মনে হয়, তালেবানদের এই জঙ্গীবাদী অপতৎপরতার পিছনের কারণ যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে অনেক বেশী হ'ল রাজনৈতিক। আফগানিস্তান যুদ্ধে যে পাকিস্তান তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই পাকিস্তানই মার্কিন মদদে তাদের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করায় এবং তাদের জান-মালের উপর হামলা চালানোয় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই ক্ষোভ থেকেই জন্ম হয় জিঘাংসার। সেই জিঘাংসার ফলাফল হ'ল একের পর এক বেপরোয়া ও নির্মম প্রতিশোধ। কিন্তু সেই প্রতিশোধের বলি হয়েছে যতটা না প্রতিপক্ষ পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী, তার চেয়ে বেশী হয়েছে নিরীহ নিরপরাধ পাকিস্তানী জনগণ।

প্রশ্ন আসে, কেন সাধারণ জনগণ এই সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে? এ ব্যাপারে তালেবানদের চরমপন্থী তাকফীরী ব্যাখ্যা হ'ল, তাগূতী সরকারের অধীনে বসবাসরত সাধারণ জনগণও তাগূতের সহযোগী। তাই তাদের হত্যা করা জায়েয এবং তাদের হত্যাকারীরা নিহত হলে তারা হবে শহীদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মঘাতী হামলাকে তারা কেবল জায়েযই মনে করে না, বরং অত্যন্ত মর্যাদার কাজ মনে করে। এভাবেই প্রতিশোধপরায়ণতা এবং আক্বীদাগত বিভ্রান্তি তালেবানদেরকে এক বেপরোয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নিষ্ঠুর অপশক্তিতে পরিণত করেছে।

সর্বশেষ পেশোয়ারের হামলার ঘটনায় সারা জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মনে হচ্ছে পাক সরকার ও সেনাবাহিনীও ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারাগারে যারা বন্দী রয়েছে, তাদেরকে দ্রুত ফাঁসি দিবে। কিন্তু তাতে লাভ হবে কতটুকু? কেননা এদের প্রভাব সম্প্রসারিত হয়ে রয়েছে বহু দূর পর্যন্ত। এর সাথে জড়িত রয়েছে বিদেশী শক্তিও। তাছাড়া পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদের পুরোপুরি দমন করাটা প্রায় অসম্ভবই। কারণ ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের যে বৈরী সম্পর্ক, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সমস্যার মূল শিকড়। সুতরাং কৌশলে তাদেরকে বশে রাখাই হ'ত সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সেটা না করে যদি সেনা অভিযানের নামে বাড়াবাড়ি করা হয় এবং যুলম-নির্যাতনের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে জিহাদের নামে এই তাকফীরী চরমপন্থী আক্বীদা সংস্কারে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহ'লে তালেবানদের এই হিংসাত্মক অপতৎপরতা কখনই ঠেকানো যাবে না। ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সেই শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে।

আক্বীদাগত বিভ্রান্তি ও চরমপন্থার বিপদ

জঙ্গী তৎপরতা সম্পর্কে পাকিস্তানে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত একটি মন্তব্য হ'ল, জঙ্গীদের এ সমস্ত হামলার নেপথ্যে রয়েছে র, মোসাদ বা সিআইএ'র গোপন এজেণ্ডা। তারাই অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এসব অঘটন ঘটাচ্ছে। কেননা তারা চায় যেকোন মূল্যে পারমাণবিক শক্তিধর একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে দুর্বল বা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে। এছাড়া পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বিদেশী ফাণ্ড আনার জন্য মাঝে-মধ্যে এরূপ নাটক সাজিয়ে থাকে।

বিষয়টি নিয়ে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এখানে অনেককে প্রশ্ন করেছি। প্রায় প্রত্যেকেই ঠিক একই ভাষায় বিদেশী ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ঘটনার প্রত্যক্ষ সংঘটনকারী চরমপন্থীদেরকে প্রশ্রয়মূলকভাবে তারা এক প্রকার দায়মুক্তিই দিয়ে দেন। এটা ঠিক যে, সাম্রাজ্যবাদী ইসলামবিদ্বেষী শক্তির ষড়যন্ত্রের বিষয়টি মোটেও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু এই জাজ্বল্যমান সত্যটি কি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব যে, আমাদের সমাজে প্রকৃতই এরূপ খারেজী আক্বীদা সম্পন্ন

ফ্যানাটিক ও উগ্রবাদী বর্বর মানুষের উপস্থিতি রয়েছে? বরং উদ্বেগজনক বাস্তবতা এটাই যে, এদের সংখ্যাটা বৈশ্বিক রাজনীতির অস্থিরতার সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষতঃ নতুনভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অতি আবেগী তরুণ ও যুবক শ্রেণীর মধ্যে দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে চরমপন্থী খারেজী আক্বীদা। মুসলিম উম্মাহ্‌র শত্রুরা কৌশলে এদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে রীতিমত মরণ খেলায় মেতে উঠেছে। তালেবান অপতৎপরতার পিছনে এই চরমপন্থী আক্বীদার ভূমিকা কোনমতেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

খারেজী তাকফীরী আক্বীদা যে কতটা ভয়ংকর তা আমরা মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র লক্ষ্য করছি। বর্তমানে পাকিস্তান ও ইরাক সহ বিভিন্ন দেশে যে আত্মঘাতী বোমা হামলাগুলো হচ্ছে, তার পিছনে মূল আদর্শিক শক্তি হ'ল এই বিধ্বংসী খারেজী মতবাদ। যার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গেছেন। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে সজাগ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। অনেকেই মুসলিম ভ্রাতৃসুলভ ভাবাবেগ থেকে তাদের অপকর্মের পিছনে যৌক্তিকতা খুঁজতে চান। এটা একটা ভুল প্রবণতা। কেননা যেটা স্পষ্ট অন্যায়, তাকে অন্যায় হিসাবে না উল্লেখ করে যদি সেই অন্যায়ের পিছনে যৌক্তিকতা খুঁজতে যাই এবং নেপথ্যের কল্পিত শত্রুর উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে অন্যায়কারীর অন্যায়কে লঘু করে দেখি, তাহ'লে তা সরাসরি অন্যায়কে সমর্থন করারই শামিল হবে। এতে করে অপরাধী তো সংশোধন হয়ই না বরং আরও উৎসাহিত হয়।

চরমপন্থা এক প্রকার ভয়াবহ মানসিক রোগ। যার মধ্যে একবার এই রোগ ঢুকে যায়, তার মধ্যে ধর্মের নামে শয়তান ইচ্ছামত খেলা শুরু করে। এই রোগে আক্রান্তদের প্রকৃত রূপ চিনতে খুব বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই তো সেদিন বাংলাদেশে 'বাংলা ভাই' নামক চরমপন্থীদের আমরা দেখেছি। এরা যে কী পরিমাণ বিকৃতমস্তিষ্ক এবং বিবেকবর্জিত তাও আমরা টের পেয়েছি হাড়ে হাড়ে। চরমপন্থী আক্বীদার ফলে তাদের স্বাভাবিক মানবীয় বোধই নষ্ট হয়ে যায়। ইসলামের নামে মানুষ হত্যা করা, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাই হয়ে যায় তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে এই চরমপন্থী শ্রেণী মুসলিম সমাজের জন্য বারবার হন্তারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

চরমপন্থীদের সবচেয়ে বড় অক্ষমতা হল ঘটনা পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে ধারণা না থাকা। ফলে নির্বোধের মত এমন সব অপরিণামদর্শী অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড করে বসে, যা কখনই কোন সুস্থ বিবেক মেনে নেয় না। যেমন ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্টে বাংলাদেশের ৬৩ যেলায় একইদিনে বোমা হামলা চালানো। এতে তারা জনমনে কোনরূপ স্থান করে নিতে পারেনি। অপরদিকে দ্বীন কায়েমের নবুঅতী ধারা পরিত্যাগ করে এবং রাষ্ট্রশক্তিকে তাগূত আখ্যা দিয়ে তারা মুসলিম সমাজে তৈরী করে সীমাহীন বিভক্তি ও বিশৃংখলা। যার ফল তাদের জন্য আখেরে কখনই সুখকর হয় না; না দুনিয়াবী না পরকালীন। সেই সাথে মুসলিম সমাজও পতিত হয় সংকটের গভীর অমানিশায়।

সুতরাং তালেবান হোক, বোকো হারাম হোক আর কথিত 'ইসলামিক স্টেট'ই হোক, এদের ইসলামের নামে চরমপন্থা বিস্তারকারী আক্বীদার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থাকাটা আমাদের মোটেও উচিৎ হবে না। এরা বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক কি-না, সেটা নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণ করা যেতেই পারে। কিন্তু সেই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমস্ত দায় যদি ইসলাম বিরোধী বিদেশী শক্তির কাঁধে চাপিয়েই ক্ষান্ত হই, তবে আত্মবিনাশী খারেজীবাদের ভয়াবহ ভূমিকা আড়ালেই থেকে যাবে। এর ফলে চূড়ান্ত আঘাতটা পড়ে ইসলামের উপরেই। কেননা এরা হয়ত অস্ত্রশস্ত্র আর কুবুদ্ধি পায় বিদেশী চরদের কাছ থেকে। কিন্তু বাহ্যত তারা তো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়া মুসলিম বলেই পরিচিত। তাদের পতাকা তো সজ্জিত থাকে ইসলামের পবিত্র কালেমা দিয়েই। তাদের তথাকথিত 'জিহাদ' তো 'জান্নাত লাভের' ভ্রান্ত প্রত্যাশাতেই। নতুবা এরা আত্মঘাতী হয় কিভাবে? কিসের স্বপ্নে? সুতরাং বৃথা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মধ্যে ডুবে না গিয়ে বাস্তবতাকে খোলা চোখে দেখতে হবে এবং সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে। নতুবা কাংখিত সমাধানের পথ আমরা কখনই খুঁজে পাব না।

এক্ষণে এই বিভ্রান্ত আক্বীদার ভয়াবহতা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা এবং এর বিরুদ্ধে আমাদের যুব সমাজকে সচেতন করা সময়ের দাবী। বিশেষতঃ বিপথগামী তরুণদেরকে ফিরিয়ে আনতে আলেম-ওলামাদের সামনে থেকে জোরালো ভূমিকা পালন করা অতীব যরূরী হয়ে পড়েছে। নতুবা এরা নিজ থেকেই হোক বা অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েই হোক, 'জিহাদ' শব্দের অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে যেভাবে মানুষের চোখে দিনে দিনে ভয়ংকর প্যানিক হিসাবে তুলে ধরছে এবং দেশে দেশে ইসলামের নামে একের পর এক যেভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

ভূমিকা : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইলমে হাদীছের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি সুনানে নাসাঈ সহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে মুসলিম বিশ্বে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীরুতায় তিনি ছিলেন অনন্য। হাদীছ চর্চায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

নাম ও পরিচিতি : ইমাম নাসাঈ-এর প্রকৃত নাম আহমাদ, পিতার নাম শো'আইব।[১২৫] উপাধি اَلْاِمَامُ الْحَافِظُ (আল-ইমামুল হাফেয)[১২৬], اَلْحَافِظُ الْحُجَّةُ (আল-হাফেযুল হুজ্জাহ),[১২৭] উপনাম আবু আব্দুর রহমান[১২৮], নিসবতী নাম আল-খোরাসানী[১২৯], আন-নাসাঈ[১৩০]। 'নাসা'-এর দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে নাসাঈ বলা হ'ত। 'নাসা' খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আরবের লোকেরা কখনো কখনো এটাকে 'নাসাবী' (النَّسَوِي) বলে থাকে। কিয়াস হিসাবে উচ্চারণ এভাবেই হওয়া উচিত। তবে নাসাঈ উচ্চারণটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[১৩১] তাঁর পুরো বংশপরিক্রমা হ'ল- আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনু শো'আইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহার আল-খোরাসানী আন-নাসাঈ।[১৩২]

কোন কোন ঐতিহাসিক ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর বংশপরিক্রমায় আহমাদ ইবনু শো'আইব ইবনে আলী-এর পরিবর্তে আহমাদ ইবনু আলী ইবনে শো'আইব উল্লেখ করেছেন।[১৩৩] এ দু'টো বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন এভাবে করা যায় যে, দাদার প্রসিদ্ধি ও পরিচিতির কারণে পুত্রের সম্পর্ক কখনো কখনো দাদার প্রতি আরোপ করা হ'ত।[১৩৪]

জন্ম : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে[১৩৫] মতান্তরে ২১৪ হিজরীতে খোরাসানের 'নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩৬] এ স্থানের দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে আন-নাসাঈ বলা হয়। এ নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।[১৩৭]

আল্লামা ইবনুল আছীর ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, তিনি ২২৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩৮] কিন্তু ইবনু মানযূর, আল-মিযযী ও আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন, انه ولد عام ٢١٥هـــ وهو الراجح، 'তিনি ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটিই প্রাধান্যযোগ্য অভিমত'।[১৩৯]

শিক্ষা জীবন : ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর সময়ে খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমে হাদীছের কেন্দ্রভূমি হিসাবে পরিচিত ছিল। সেখানে অনেক খ্যাতনামা বিদ্বানের সমাবেশ ঘটেছিল। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় জন্মভূমিতেই প্রখ্যাত আলেমগণের তত্ত্বাবধানে পড়া-লেখা শুরু করেন।[১৪০] পনের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বদেশেই কুরআন মাজীদ হিফয ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[১৪১]

দেশ ভ্রমণ : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ২৩০ হিজরী মুতাবিক ৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন দেশ ও জনপদের খ্যাতিমান মনীষীদের দরজায় কড়া নাড়েন।[১৪২]

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) নিজেই বলেছেন, رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومائتين أقمت عنده سنة وشهرين 'আমি ২৩০ হিজরীতে সর্বপ্রথম কুতায়বা ইবনু সাঈদের নিকট গমন করি এবং তাঁর সান্নিধ্যে এক বছর দু'মাস অবস্থান করি'।[১৪৩] এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনের বছর।[১৪৪]

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'তিনি অনেক বড় বড় শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খুরাসান, হিজায, ইরাক, জাযীরা, শাম, মিশর প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেন'।[১৪৫]

---

* প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১২৫. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), ১/১০০৬ পৃঃ।
১২৬. তারীখুত তাশরীইল ইসলামী, পৃঃ ৯৫।
১২৭. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মুকাদ্দামাতু যাহারুর রিবা আলাল মুজতাবা (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), ২ পৃঃ।
১২৮. কাশফুয যুনূন, ১/১০৬ পৃঃ; মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৬৫।
১২৯. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ২/৬৯৮ পৃঃ; ইবনুল ইমাদ হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান যাহাবা (বৈরূত : দারুল ফিকার, তাবি), ২/২৩৯ পৃঃ।
১৩০. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রিঃ/১৪১৩হিঃ), ১১/১৪০ পৃঃ; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রিঃ/১৪১৩হিঃ), ১/২৭ পৃঃ।
১৩১. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, বঙ্গানুবাদ: ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খ্রিঃ/১৪২৫হিঃ), পৃঃ ২৪৪।
১৩২. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ খ্রিঃ/১৪১৭হিঃ), ১৪/১২৫ পৃঃ।
১৩৩. তারীখুত তাশরীইল ইসলামী, পৃঃ ৯৫।
১৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪/৩৯ পৃঃ।
১৩৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪১ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৮ পৃঃ।
১৩৬. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান কন্নৌজী, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৫ খ্রিঃ), ২৫৩ পৃঃ।
১৩৭. মুহাম্মাদ আবু যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন (আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তাবি), ৩৫৭ পৃঃ।
১৩৮. ড. আব্দুল্লাহ মুছতফা মুরতাযা, রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ ফিস সুনানিল কুবরা, অপ্রকাশিত এম.এ থিসিস, গাযা : জামে'আতুল আযহার, ২০১২ ইং/১৪৩৩ হিঃ, পৃঃ ১৩।
১৩৯. ঐ।
১৪০. ড. তাকীউদ্দীন নাদভী, আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, (বৈরূত : দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৭ ইং/১৪২৮ হিঃ), পৃঃ ২৫০-২৫১।
১৪১. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ ফিস সুনানিল কুবরা, পৃঃ ১৪।
১৪২. হায়াতুল মুছান্নিফীন, পৃঃ ৬২।
১৪৩. প্রাগুক্ত, ১৪ পৃঃ।
১৪৪. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, ২৪৪ পৃঃ।
১৪৫. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, ২৫১ পৃঃ।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, رَحَلَ إِلَى الْآفَاقِ، وَاشْتَغَلَ بِسَمَاعِ الْحَدِيْثِ وَالاجْتِمَاعِ بِالْأَئِمَّةِ الْحُذَّاقِ، وَمَشَايِخُهُ الَّذِيْنَ رَوَى عَنْهُمْ مُشَافَهَةً. 'তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন এবং অভিজ্ঞ ইমামগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণে মনোনিবেশ করেন। আর যাদের নিকট থেকে তিনি মুখে মুখে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাঁদের নিকট থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেন।[১৪৬] আল্লামা ইউসুফ আল-মিযযী 'তাহযীবুল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন, طاف البلاد وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من جماعة 'তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং খোরাসান, ইরাক, হিজায, মিসর ও জাযীরার একদল মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন'।[১৪৭]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, 'জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তিনি খোরাসান, হিজায, মিসর, ইরাক, জাযীরা, সিরিয়া এবং সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণ করেন। অতঃপর মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন'।[১৪৮]

শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বদেশে হুমাইদ ইবনে মাখলাদ (মৃঃ ২৪৪ হিঃ), আম্মার ইবনুল হাসান (মৃঃ ২৪২ হিঃ) প্রমুখ খ্যাতিমান শায়খের নিকট শৈশবকালে শিক্ষার্জন করেন।[১৪৯]

ড. তাকীউদ্দীন নদভী স্বীয় 'আ'লামুল মুহাদ্দিছীন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি অসংখ্য মনীষী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম বিদেশে পরিভ্রমণ করে কুতাইবা ইবনু সাঈদ (মৃঃ ২৪০ হিঃ)-এর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (ইমাম বুখারী (রহঃ)-এরও উস্তায), মুহাম্মাদ ইবনু নযর, আলী ইবনু হাজার, ইউনুস ইবনু আব্দুল আলা, মুহাম্মাদ বিন বাশার, ইমাম আবূ দাঊদ সিজিস্তানী প্রমুখ। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-কেও ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর শিক্ষক হিসাবে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে আবু যুর'আ ও আবু হাতিম আর-রাযী থেকেও তার হাদীছ বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে।[১৫০] তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে আরো রয়েছেন, বিশর ইবনে হেলাল, আল-হাসান ইবনুস সাব্বাহ আল-বাযযার, আম্মার ইবনে খালেদ আল-ওয়াসিতী, ইমরান ইবনে মূসা আল-কাযযায প্রমুখ।[১৫১]

সুনানে কুবরাতে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ৪০৩ জন শিক্ষকের নিকট থেকে এবং সুনানে ছুগরা তথা সুনানে নাসাঈতে ৩৩৫ জন শায়খের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু আসাকিরের বর্ণনা মতে তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৪৪৪ জন।[১৫২]

ছাত্রবৃন্দ : দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হাদীছের দরস প্রদান শুরু করেন। অনেক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছে।

আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'মিসরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে তাঁর রচনাবলী প্রসার লাভ করে। বহু জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। অতঃপর তিনি দামেশকে চলে যান'।[১৫৩]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'লেন- 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক ইবনুস সুন্নী, আহমাদ ইবনুল হাসান আর-রাযী, আবুল হাসান আহমাদ আর-রামলী, আবু জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাহবী, আবু সাঈদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবী, আবু জা'ফর আহমাদ আত-তাহাবী প্রমুখ।[১৫৪]

সুনানু নাসাঈ সংকলন : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) প্রথমে 'আস-সুনানুল কুবরা' নামে একটি বৃহৎ হাদীছগ্রন্থ সংকলন করেন। যাতে ছহীহ ও যঈফ হাদীছের সংমিশ্রণ ছিল। এ সম্পর্কে আল্লামা আবু যাহূ বলেন, 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বিশুদ্ধ ও ক্রটিযুক্ত হাদীছ সম্বলিত 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর একে সংক্ষেপ করে 'আস-সুনানুছ ছুগরা' সংকলন করেন। এর নাম দেন 'আল-মুজতাবা'। ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর নিকটে এ গ্রন্থের সব হাদীছই ছহীহ'।[১৫৫]

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم– 'যখন আমি সুনানে নাসাঈ সংকলন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লাম, তখন কিছু শায়খ থেকে হাদীছ বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হ'লে আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তেখারা করলাম। অতঃপর তাদের হাদীছ পরিত্যাগের বিষয়ে কল্যাণকর ইঙ্গিত পেলাম। ফলে আমি তাতে এমন কিছু হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি, যেগুলো তাদের নিকট থেকে আমার নিকট উচ্চতর সনদে পৌঁছেছিল'।[১৫৬]

সাইয়িদ জামালুদ্দীন বলেন, 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) প্রথমে 'আস-সুনানুল কাবীর' নামক একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। হাদীছের বিভিন্ন সূত্র সংবলিত এমন গ্রন্থ আর কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়নি'।[১৫৭]

---

১৪৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১১/১৪০ পৃঃ।
১৪৭. তাহযীবুল কামাল, ১/৩২৯ পৃঃ।
১৪৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/১২৭ পৃঃ।
১৪৯. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ ফিস সুনানিল কুবরা, পৃঃ ১৪।
১৫০. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৫২।
১৫১. প্রাগুক্ত, ১৪/১২৫-২৭ পৃঃ।
১৫২. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম আন-নাসাঈ ফিস সুনানিল কুবরা, পৃঃ ২৩।

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২।
১৫৪. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১৪/৩২৯-৩৩৩ পৃঃ।
১৫৫. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪০৯।
১৫৬. ড. আবু জামীল আল-হাসান আল-আলামী, উম্মাহাতু কুতুবিল হাদীছ ওয়া মানাহিজুত তাছনীফ ইনদাল মুহাদ্দিছীন (২০০৫ইং/১৪২৬ হিঃ), পৃঃ ১২৪; ড. মুহাম্মাদ ইবনু মাত্বার আয-যাহরানী, তাদভীনুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ (মদীনা মুনাওয়ারাহ : দারুল খুযায়রী, ১৯৯৮ খ্রিঃ), পৃঃ ১৫৯-১৬০।
১৫৭. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৫ পৃঃ।

ইবনুল আছীর বলেন, ফিলিস্তীনের রামাল্লার আমীর ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সংকলিত 'আস-সুনানুল কুবরা'-তে সন্নিবেশিত সকল হাদীছই কি ছহীহ? উত্তরে তিনি বললেন, না। এতে ছহীহ ও যঈফ মিশ্রিত আছে। তখন আমীর তাঁকে বললেন, এ গ্রন্থ থেকে শুধু ছহীহ হাদীছগুলো চয়ন করে আমাদের জন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থ সংকলন করুন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আস-সুনানুল কুবরার যে সকল হাদীছের সনদে ত্রুটি আছে বলে অভিযোগ ছিল, সেগুলো বাদ দিয়ে 'সুনানুল মুজতাবা' সংকলন করেন'।[১৫৮]

ড. তাকীউদ্দীন নাদভী লিখেছেন, উপরোক্ত কাহিনী আল্লামা ইবনুল আছীর স্বীয় 'জামিউল উছূল' গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ 'মিরক্বাত'-এ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যাহাবী বলেছেন, উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক নয়; বরং সুনানে কুবরাকে সংক্ষেপ করে 'মুজতাবা' সংকলন করেছেন ইমাম নাসাঈর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুস সুন্নী।[১৫৯]

আল্লামা ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন, এ গ্রন্থটির নাম اَلْمُجْتَنَى অথবা اَلْمُجْتَبَى উভয়টিই সমার্থক শব্দ। তবে শেষোক্ত اَلْمُجْتَبَى শব্দটিই অধিক প্রসিদ্ধ। যখন কোন মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা শেষে বলবেন, انَّ النَّسَائِىَّ رَوَى حَدِيْثًا 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হাদীছটি স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তখন এটা দ্বারা 'সুনানুল মুজতাবা'কেই বুঝাবে, সুনানুল কুবরাকে নয়।[১৬০] উল্লেখ্য, এটিই 'সুনানে নাসাঈ' নামে পরিচিত। 'মুজতাবা' শব্দের অর্থ হ'ল বাছাইকৃত চয়নকৃত, নির্বাচিত এবং 'মুজতানা' শব্দের অর্থ হ'ল সংগৃহীত বা আহরিত ফল।[১৬১]

সুনানে নাসাঈর হাদীছ ও অধ্যায় সংখ্যা : ইবনুল আছীরের মতে, সুনানে নাসাঈতে সংকলিত হাদীছ সংখ্যা ৪৪৮২টি।[১৬২] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর গণনা অনুযায়ী নাসাঈর মোট হাদীছ সংখ্যা ৫৭৫৮।[১৬৩] এতে মোট একান্নটি কিতাব (অধ্যায়) রয়েছে।[১৬৪]

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীছের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ বিশদ ও ব্যাপক।[১৬৫] ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ গ্রন্থ সংকলনে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর রীতি অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের উভয়ের প্রবর্তিত মানহাজ বা নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।[১৬৬]

সুনানে নাসাঈর সত্যায়ন ও মূল্যায়ন : ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাঁর সংকলিত 'সুনানুল কুবরা'-কে পরিমার্জন ও সংক্ষেপ করে 'সুনানুছ ছুগরা' তথা 'সুনানে নাসাঈ' সংকলন করে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله– 'সুনানুল কুবরা'-এর সব হাদীছ ছহীহ। তবে কিছু কিছু হাদীছের সনদ ত্রুটিযুক্ত। আর 'মুজতাবা' তথা 'সুনানে নাসাঈ'তে নির্বাচিত সব হাদীছই ছহীহ'।[১৬৭]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে রুশাইদ (মৃঃ ৭২১ হিঃ) বলেন, 'সুনান পর্যায়ে হাদীছের যত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি অভিনব রীতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এর সজ্জায়নও চমৎকার। এতে বুখারী ও মুসলিম উভয়ের রচনারীতির মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। সাথে সাথে হাদীছের 'ত্রুটি'ও এতে বর্ণনা করা হয়েছে'।[১৬৮]

আবু যাহূ 'আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মোদ্দাকথা, 'মুজতাবা' তথা 'সুনানে নাসাঈ'তে অনুসৃত ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর শর্ত ছহীহাইনের পর সবচেয়ে বেশী সুদৃঢ় শর্ত। যা তাঁকে মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে মহান করেছে।[১৬৯] তিনি আরো বলেন, 'মুজতাবা তথা সুনানে নাসাঈতে যঈফ এবং সমালোচিত রাবী বর্ণিত হাদীছ খুবই কম রয়েছে। এ গ্রন্থের মর্যাদা ছহীহাইনের পরে এবং এটি সুনানে আবু দাঊদ ও সুনানে তিরমিযীর চেয়ে অগ্রগণ্য।[১৭০]

হাফেয আবুল হাসান মু'আফেরী বলেন, 'মুহাদ্দিছগণের বর্ণিত হাদীছ সমূহের প্রতি যখন তুমি লক্ষ্য করবে, তখন এ কথা বুঝতে পারবে যে, ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর সংকলিত হাদীছ অপরের সংকলিত হাদীছের তুলনায় বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী'।[১৭১]

তাজুদ্দীন সুবকী স্বীয় পিতা তাকীউদ্দীন সুবকী ও উস্তায হাফিয যাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, وان سننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا– 'ছহীহাইনের পর অন্যান্য সুনান গ্রন্থ সমূহের চেয়ে সুনানে নাসাঈতে কম সংখ্যক যঈফ হাদীছ রয়েছে'।[১৭২]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইবনু মাত্বার আয-যাহরানী বলেন, 'মোদ্দাকথা হ'ল, ছহীহাইন তথা বুখারী-মুসলিমের পর অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় 'সুনান নাসাঈ'-তে যঈফ হাদীছ ও সমালোচিত রাবী কমই আছে। এর নিকটবর্তী হ'ল সুনানে আবূ দাঊদ ও তিরমিযী। অন্যদিকে সুনান ইবনু মাজাহ তার বিপরীত'।[১৭৩]

[চলবে]

১৫৮. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ, পৃঃ ২১৯।
১৫৯. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৫৯।
১৬০. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৫ পৃঃ।
১৬১. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৫।
১৬২. মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৬৮।
১৬৩. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী কৃত তাহকীক সুনান নাসাঈ দ্রঃ।
১৬৪. মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৩২।
১৬৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪/৩৯ পৃঃ।
১৬৬. মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৩৮৮।
১৬৭. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪০৯।
১৬৮. আ'লামুল-মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৬০।
১৬৯. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১০।
১৭০. ঐ।
১৭১. মুকাদ্দামাতু যাহরির রুবা আলাল মুজতাবা, পৃঃ ৪।
১৭২. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৫৮।
১৭৩. তাদভীনুস সুন্নাহ, পৃঃ ১৬০-১৬১।

হাদীছের গল্প

হালাল রুযী নবীগণের সুন্নাত

শাদ্দাদ ইবনু আওসের বোন উম্মে আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে তাঁর ইফতারের সময়ে এক পেয়ালা দুধ পাঠালেন। কারণ তখন ছিল বড় দিন ও প্রচণ্ড গরমের সময়। এতে তিনি তার (উম্মে আব্দুল্লাহ্র) দূতকে তার কাছে ফেরত পাঠালেন (একথা জিজ্ঞেস করার জন্য যে,) এ দুধ তুমি কোথায় পেয়েছ? তিনি বলে পাঠালেন, আমার বকরীর দুধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবার দূতকে তার নিকটে ফেরত পাঠালেন একথা বলে যে, তুমি এ বকরী কোথায় পেয়েছ? তিনি উত্তরে বলে পাঠালেন, আমি আমার অর্থ দিয়ে এটা ক্রয় করেছি। তখন তিনি উক্ত দুধ পান করলেন। পরের দিন উম্মে আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার প্রতি বড় দিন ও প্রচণ্ড গরমের কষ্টের সমবেদনা প্রকাশ করে উক্ত দুধটুকু আপনার নিকটে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি এতে আমার দূতকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন (এর কারণ কি?)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার পূর্বের রাসূলগণকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করবে এবং কেবল সৎ আমল করবে' *(হাকেম হা/৭১৫৯; ছহীহুল জামে' হা/১৩৬৭; মু'জামুল কাবীর হা/৪২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৩৬)*।

নেতৃত্ব হ'তে বঞ্চিত হ'লে ধৈর্যধারণ করতে হবে

আছেম বিন সুওয়াইদ বিন ইয়াযীদ বিন জারিয়াহ আল-আনছারী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আমাদের নিকট আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস) বলেন, বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের নেতা উসাইদ বিন হুযায়ের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল। অতঃপর বনু যাফার গোত্রের পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কথা বলল। তাদের অধিকাংশ ছিল নারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের (বনু যাফার) জন্য কিছু মাল দিলেন। যা তিনি লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে উসাইদ! তুমি তো আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে (অর্থাৎ প্রথমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করনি)। এমনকি আমাদের হাতে যা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। তুমি যখন শুনবে যে, আমাদের নিকট খাবার (শস্য) এসেছে, তখন তুমি এসে আমাকে ঐ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিবে বা ঐ বিষয়ে অবগত করাবে। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন তিনি তথায় অবস্থান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে খায়বার থেকে খাদ্যদ্রব্য তথা যব ও খেজুর আসল। নবী করীম (ছাঃ) তা লোকদের মাঝে বিতরণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আনছারগণের মাঝে বণ্টন করলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর ঐ আহলে বায়তের মাঝে বণ্টন করলেন এবং পূর্ণ মাত্রায় দিলেন। তখন উসাইদ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ আপনাকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে বললেন, হে আনছার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদেরকেও উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দান করুন। কেননা আমি যতটুকু জানি, তোমরা সৎ ও ধৈর্য ধারণকারী। তোমরা অচিরেই আমার পরে বণ্টন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সাথে হাওযে কাওছারে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে *(ইবনু হিব্বান হা/৭২৭৭; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৬৯৭৪; বুখারী হা/৩৭৯২; মুসলিম হা/১৮৪৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৯৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি মু'জিযা

আছেম বিন ওমর বিন কাতাদা তার পিতা হ'তে তার দাদা কাতাদা বিন নু'মান (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক ঘোর অন্ধকার ও বৃষ্টির রাতের কথা। আমি বললাম, যদি আমি এই রাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারতাম (তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত)! আমি তাই করলাম। (ছালাত শেষে) নবী করীম (ছাঃ) যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমাকে দেখতে পেলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা খেজুরের শুকনো ডাল, যাতে ভর দিয়ে তিনি হাঁটছিলেন। তিনি বললেন, কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? এ সময় তুমি এখানে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সুযোগ গ্রহণ করেছি। তিনি খেজুরের ডালটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বাড়িতে প্রবেশ করেছে। তুমি এই ডালটা নিয়ে যাও। তোমার বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত এটা ধরে রাখবে। (বাড়িতে পৌঁছার পর) বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গিয়ে তাকে পাকড়াও করবে এবং খেজুর ডালটা দিয়ে তাকে পিটাবে। অতঃপর আমি মসজিদ থেকে বের হ'লাম। খেজুর ডালটা তখন মোমবাতির মত আলো ছড়াতে লাগল। আমি সেই আলোতে আমার পরিবারের নিকট উপস্থিত হ'লাম। এসে তাদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। অতঃপর ঘরের এক কোণায় দৃষ্টি দিতেই হঠাৎ একটা শজারু দেখতে পেলাম। আমি খেজুরের ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করতে থাকলাম। অবশেষে সে পালিয়ে গেল *(তাবারানী, মু'জামুল কাবীর হা/৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২১৫৪; আহমাদ হা/১১৬৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৩৬)*।

-আব্দুল মালেক, ঝিনাইদহ।

**সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।**

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পাপী ব্যক্তি তার পাপের শাস্তি পাবে

এক সময় ইরাকের মুছেলে এক সৎ ব্যক্তি বাস করতেন। তার নাম ছিল আলী ইবনু হারব। তিনি বলেন, আমি নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ক্রয় করার জন্য মুছেল থেকে সুররামান রায়া নামক স্থানে যাচ্ছিলাম। সে সময় দাজলা নদীতে কিছু নৌকা ছিল। যেগুলো ভাড়ায় লোকজন ও মালামাল পারাপার করত। আমি একটি নৌকায় আরোহণ করলাম।

নৌকা আমাদেরকে নিয়ে সুররামান রায়ার দিকে চলতে শুরু করল। নৌকায় মালামাল ব্যতীত আমরা পাঁচ জন যাত্রী ছিলাম। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। আকাশ খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। দাজলা নদীও ছিল শান্ত। নৌকা তরতর করে বয়ে চলছিল। যাত্রীদের অধিকাংশই তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। আমি দাজলা নদীর উভয় তীরের সৌন্দর্য অবলোকন করছিলাম। হঠাৎ পানি থেকে একটি বড় মাছ লাফিয়ে নৌকায় এসে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে মাছটি ধরে ফেললাম। বিশালকায় মাছের লেজের ঝাপটানিতে লোকদের তন্দ্রা দূর হয়ে গেল। মাছ দেখতে পেয়ে তাদের একজন বলল, এই মাছ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা সামনে কোন তীরে নেমে মাছটি ভুনা করে খাব। সকলে একমত হওয়ায় তীরের দিকে নৌকা ঘুরিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা তীরে অবতরণ করে ঘন গাছ বিশিষ্ট এক স্থানে অবস্থান করলাম, যাতে জ্বালানী জমা করে মাছটি রান্না করা যায়।

আমরা সেখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। একটি মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, পাশেই পড়ে আছে একটি ধারালো চাকু। অদূরে অন্য এক যুবক হাত-পা এবং মুখে কাপড় বাঁধা। সে বাঁধন মুক্ত হওয়ার প্রানান্ত চেষ্টা করছে। আমরা দ্রুত সামনে গিয়ে ঐ ব্যক্তির সকল বাঁধন খুলে দিলাম। তার চেহারায় অত্যন্ত ভীতি ও নিরাশার ছাপ ছিল। বাঁধন মুক্ত হয়ে সে বলল, দয়া করে আমাকে একটু পানি দাও। আমরা তাকে পানি দিলাম। এরপর আমাদেরকে সে পূর্ণ ঘটনা শুনাল। সে বলল, আমি ও এ মৃত ব্যক্তি একই কাফেলায় ছিলাম। আমরা মুছেল থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছিলাম। এ নিহত ব্যক্তি ভাবল যে, আমার নিকট অনেক অর্থ আছে। তাই সে আমার সাথে আন্তরিকতা গড়ে তোলে এবং আমার ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়। আমারও তার উপর যথেষ্ট ভরসা ছিল। কাফেলা বাগদাদ যাওয়ার পথে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এ তীরে তাঁবু ফেলল। রাতের শেষ ভাগে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে থাকায় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পারিনি। আমার ঘুমের মধ্যে নিহত ব্যক্তি আমাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। মুখও কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়, যাতে আমি চিৎকার করতে না পারি। এরপর সে আমাকে হত্যা করার জন্য মাটিতে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর বসে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন আমি বললাম, ওহে! তুমি আমার সকল সম্পদ নিয়ে নাও, তবুও আমাকে প্রাণে মের না। সে এতে রাযি হ'ল না; বরং তার বেল্টের সাথে বেঁধে রাখা ধারালো চাকু বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সহজে চাকুটি বের করতে পারল না। ফলে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চাকু বের করতে গেল। এতে চাকু তার নিজ গলায় বিদ্ধ হয়ে শাহরগ কেটে গেল। তার প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হ'লে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এ পাপিষ্ঠ আমার চোখের সামনে তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেল। আমি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা যেখানে আছি, কম লোকই এই পথ দিয়ে যায়। ফলে বাঁধনমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। অবশেষে আমি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট কাউকে পাঠিয়ে আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। আমি সর্বদা এ দো'আই করছিলাম। এ কারণেই হয়ত আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন। বলতো, তোমরা কি কারণে এ জনমানবহীন স্থানে আসতে বাধ্য হয়েছ?

কাফেলার লোকেরা বলল, একটা মাছ আমাদেরকে তোমার নিকট আসতে বাধ্য করেছে। যেটা পানি থেকে আমাদের নৌকায় লাফিয়ে উঠেছিল। আমরা এই মাছ ভুনা করে খাবার জন্য এখানে এসেছি। কাফেলার লোকদের কথা শুনে ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ঐ মাছটিকে তোমাদের নৌকায় পাঠিয়েছিলেন আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। এরই মধ্যে মাছটি নৌকা হ'তে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবার ধারণা হ'ল যে, আল্লাহ মাছকে ঐ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যই পাঠিয়েছিলেন।

এভাবে যখন আল্লাহ তা'আলা কিছু করতে চান, তখন তার জন্য কারণ সৃষ্টি করে দেন *(বুখারী হা/৩৭৭৩)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মযলূমের বদ দো'আ থেকে দূরে থাক। কেননা মযলূমের দো'আ এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন আড়াল থাকে না'। *(বুখারী হা/২৪৪৮; মুসলিম হা/১৯; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ২৬/৩৮৫; ইবনু মুল্লাকান, ত্বাবাকাতুল আওলিয়া ১/১৮০)।*

** আব্দুর রহীম*
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কবিতা

চাইবো কি আর

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

মনের কপাট খোলে আমি করবো কি আর প্রার্থনা?
চাইবো যাহা তোমার কাছে আছে তোমার সবজানা।
চাইবো শুধু তোমার কাছে তোমায় ডাকার শক্তিটা.
হৃদয় ভরে দাও কেবলই তোমার উপর ভক্তিটা।
করতে পারি তোমায় স্মরণ দু'চোখ ভরা ক্রন্দনে,
আমার শির তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ুক আনমনে।
থাকতে তোমার পথের পরে কোন বাধা মানবো না,
শিরক, বিদ'আত ও জাহিলিয়াতের হাতছানিটা শুনবো না।
সরল-সঠিক তোমার পথে চালাও তুমি রহমান,
দীপ্ত ঈমান দাও তুমি দাও হই না যেন নাফরমান।
তোমার দেওয়া দান যেটা লই যেন তা খোশদীলে,
সুখ সাগরে ভাসাতে ভেলা এটা তুমি নাই দিলে।
যা দিয়েছ এই দুনিয়ায় তাহার শুকর হচ্ছে কই?
তার পরে কি চাইবো বল চাইবো না আর কোনটাই।
থাকলে খুশী দোজাহানে এটাই বড় পাওনা মোর,
আমার পরে ঝরুক নে'মত খুলুক তব রহমতের দোর।
চাই না কিছু চাই কেবলই তোমার দীদার শেষ দিনে,
আমার নয়ন তোমার ছূরাত সঠিকভাবে নিক চিনে।
নয়ন ভরে দেখি আল্লাহ তোমার সৃষ্ট বিশ্বটা,
নাই তুলনা সৃষ্টি তোমার এত সুন্দর দৃশ্যটা।
ইচ্ছা জাগে দেখতে তোমায় কত সুন্দর তুমি তাই,
পুরাও মনের অযুত আশা আমার প্রার্থনা এটাই।
আমার চরণ নাই চলে যায় কভু কোন ভ্রান্তিতে,
বিচার শেষে জান্নাতে তব থাকতে পারি শান্তিতে।

***

পরশ পাথর

মুহাম্মাদ মুমতায আলী খান
সহকারী শিক্ষক, ঝিনা দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসা,
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

নয়া যামানার নও বেলাল তুমি আত-তাহরীক,
তোমার আযান জাগালো প্রাণ বিশ্ব চতুর্দিক।
ছহীহ পথ পাইনি খুঁজেছিলাম অন্ধকারে,
দেখিয়ে দিলে নয়াদিগন্ত অভিজ্ঞানের দ্বারে।
তাকলীদের প্রাচীরে বন্দী রেওয়াজী জনগণ,
তুমি জানালে প্রথম আহলেহাদীছ আন্দোলন।
জুজুবুড়ির ভয় দেখানো আমরা ছোট্ট খোকা নই,
অহি-র বিধান বলছে ডেকে শুনছো নাকি ঐ।
তাহরীক তুমি কালের সাক্ষী, আমরা আছি সাথী,
নির্ভীক সেনা এগিয়ে চলো, বাতিলের মাথায় লাথি।
তোমার পাতার প্রতিটি শব্দ যেন শব্দবোমা,
আযাযীল আজ ভাগছে ডরে বলছে মাগো মা।
তোমার পরশ পেয়ে জাতি খুলছে ভাঙ্গা ডোর,
যুগে যুগে তাহরীক তুমি পরশ পাথর॥

***

সত্যের ডাক

জারীন তাসনীম
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা, রাজশাহী।

হে মুসলিম নওজোয়ান! উচু কর তোমার শির
ঝেড়ে ফেল সব ক্লান্তি, মুছে ফেল অবসাদ।
উঠাও তোমার ঈমানের শাণিত তলোয়ার
চেয়ে দেখ সমগ্র বিশ্বে ছেয়ে গেছে অন্যায়-অত্যাচার
দৃপ্তপদে চল সেখানে, যেখানে মুসলমান হচ্ছে
নিগৃহীত, নির্যাতিত।
তুমি হও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
তিমির রজনীতে চল নির্ভয়ে
কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে
হানা দাও কাফিরদের আস্তানায়।
তোমাকে হ'তে হবে খালিদ, হামযার আদর্শে
উজ্জীবিত দুঃসাহসী এক বীর।
আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে
প্রকম্পিত কর গগণ-পবন।
শান্তির আলোকবর্তিকা নিয়ে
সংস্কার কর এ বর্বরোচিত সমাজকে
তোমার পথ পানে চেয়ে আছে
কত অসহায় মা-বোন!
ওঠ, থেকো না আর চোখ বুজে
রাসূলের দেখানো পথ ধর
তাওহীদের পতাকা উড্ডীন কর।
শান্তির সমীরণ বইয়ে দাও ধরণীর প্রতিটি প্রান্তে
সাম্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দাও
অসাম্যে কলুষিত সমাজে।
জাগো, জাগো, হে নবীন-তরুণ!
হাতে নাও সত্যের তরবারী,
এগিয়ে চল সম্মুখপানে।

***

যে বোধে বিবেক জাগে

সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

আমি অস্ত যুগের কেউ নই
আমি উদ্ভাসিত আগামীকাল
কর্তিত ফসলের চারা, সবুজ চিরকাল।
হালাল রূযীর সন্ধানে অভুক্ত কাটিয়েছি কত কাল
তবু আমি রয়েছি সতেজ চিরকাল।
আমি সময়ের উন্মোচিত ঘড়ি
যার আগমন বোধ শক্তিকে নাড়া দেয়।
বাঘের আগমন রোধ করেছিল মেষের রাখাল
আমি বোধ করি ধেয়ে আসে নূহের প্লাবন
বোধ হয় এই বুঝি ইসরাফীল শিংগায় ফুঁক দেয়।
আশাহত নই আমি দীপ জ্বেলে যাই,
কান পেতে শোন বখতিয়ারের ঘোড়ার
আওয়াজ যেন শোনা যায়।
প্রবল বেগে ধাবমান সহস্র অশ্বের হ্রেস্বা ধ্বনি
আমাকে প্রতিবাদের ভাষা শেখায়।
আমি শুনতে পাই ইয়াছরিবের বসন্ত যুগের গান
আযানের ধ্বনিই আমাদের আলোকিত জীবনের আহ্বান।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মুসনাদে আহমাদে। ২. ২৭৭৪৬ টি।
৩. ৭০০৮ টি মতান্তরে ৭৫৬৩ টি। ৪. ৩০৩৩ টি।
৫. ৫২৭৪ টি। ৬. ৩৯৫৬ টি।
৭. ৫৭৫৮ টি। ৮. ৪৩৪১ টি।
৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রণীত 'ফাতহুল বারী'।
১০. ছহীহ বুখারী।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. দাঁড়িপাল্লা। ২. দুই সতীন। ৩. বই।
৪. নিজের ছবি। ৫. সূর্য।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)

১. ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ ছাড়া আরো ৫টি হাদীছ গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর?
২. মাওকূফ হাদীছ কাকে বলে?
৩. মাকতূ হাদীছ কাকে বলে?
৪. যঈফ হাদীছের কয়েকটি প্রকার উল্লেখ কর?
৫. যঈফ হাদীছের উপর আমল করার হুকুম কি?
৬. হাদীছের সনদ বলতে কি বুঝায়?
৭. হাদীছের মতন কাকে বলা হয়?
৮. কোন খলীফার যুগে সর্বপ্রথম গ্রন্থ আকারে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়?
৯. হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন কিতাবটি লিপিবদ্ধ করা হয়?
১০. বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. তোমার বাবা তোমাকে দু'টি টাকা দিয়া
বললেন, বাজার হ'তে এমন জিনিস আনবা কিনিয়া
যাতে বাড়ী-ঘর সব যাবে ভরিয়া
বলত, সে বাজার থেকে আসল কোন্ জিনিস নিয়া?

২. সমুদ্রেতে জন্ম আমার থাকি সবার ঘরে
একটু পানির পরশ পেলে যাইগো আমি মরে।

৩. হাযার হাযার বাড়ী সেথা নারী একজন
এক রাণী রাজা বহু হাযার স্বজন
প্রসব করে হাযার সন্তানে রাণী একটি হায়
শূন্য পরে সে রাজরাণী বলত কোথায়?

৪. পক্ষী নয় তবু তার আছে দু'টি পাখা
লেজ-মাথা সবই আছে দেহ তার ঢাকা
বহু মানুষ চড়ে তার উপরে
একটুখানি বুদ্ধি খাটিয়ে চিনে নাও তারে।

৫. আমি থাকি বিশ্বময় ছাহেব-বিবির বক্ষময়
ভাঙ্গা আমার দেহখানি তৃষ্ণা মিটায় কালো পানি
তামার টুপি মোর মাথার পরে
দাঁত দিয়ে মোর অশ্রু ঝরে।

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ ও ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় **'সোনামণি'** কেন্দ্রের উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক 'দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত প্রায় ৫০ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক আব্দুর রশীদ আখতার, 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মীযানুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি ওমর ফারূক। প্রশিক্ষণের সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান।

হাটরা, মোহনপুর, রাজশাহী : ৪ঠা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব হাটরা হাফিযিয়া মাদরাসায় এক **'সোনামণি'** প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয নূরুযযামান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ রাসেল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হাবীবুর রহমান।

জীবন গড়ি

মোবাশ্বিরা তাজরী
সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

এসো সকল ভাই-বোনেরা
আল্লাহ্‌র পথে চলি,
সত্য-ন্যায়ের আদর্শেতে
মোদের জীবন গড়ি।
আদায় করি ছালাত মোরা
ফরয ছিয়াম রাখি
ইসলামেরই বিধি বিধান
সবই মেনে চলি।
সকল বিধান বাতিল করি
অহি-র বিধান কায়েম করি
আল্লাহ্‌র পথে চলি মোরা
সফল জীবন গড়ি।

Contents

স্বদেশ

পোল্ট্রিশিল্পকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র

পাটশিল্প ধ্বংস এবং গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিরতার পাশাপাশি পোল্ট্রিশিল্পকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতের এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের কুশীলব হচ্ছে দেশের ভিতরের একটি চক্র। তারা দেশের পোল্ট্রিশিল্পকে ধ্বংস করে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা মুরগীর খাবার, বাচ্চা, ডিম আমদানির সুযোগ সৃষ্টিতে এবং দেশী এ শিল্পের গতি থামিয়ে দিতে নানা অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ হিসাবে মাঝে মাঝে বার্ডফ্লুসহ নানা রোগের গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এতে বাধ্য হয়েই অনেক পোল্ট্রি মুরগী মেরে ফেলতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ হাযার খামার বন্ধ হয়েছে এবং বেকার হয়েছে ২৫ লাখ শ্রমিক। অথচ গত আড়াই দশকে গড়ে ওঠা প্রায় দেড় লাখ খামারে দৈনিক ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিম ও ১ হাযার ২০০ টন গোশত উৎপাদিত হচ্ছিল।

বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রতিবেশী দেশ ভারতের কিছু কোম্পানী আমাদের দেশে ব্যবসা করে। তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা ফলাফল হচ্ছে আমাদের দেশের মুরগির গোশত খাওয়ার উপযোগী নয়। ডিমের ভিটামিন কম, এ ডিমের বাচ্চা উৎপাদন করলে রোগা হবে। তাদের ইচ্ছামতো ভারত থেকে মুরগী, ডিম, বাচ্চা এবং খাবার আমদানী করতে হবে।

অপরদিকে খামারিদের অভিযোগ, দেশের কোন খামারে রোগ হলেই সরকার খামার ধ্বংসকেই প্রতিরোধের উপায় হিসাবে বেছে নেয়। বিকল্প পথ গ্রহণের জন্য কোন পরিকল্পনা বা গবেষণাও হয় না। বিদেশীরা যা বলেন, তাই দিয়ে চলছে দেশ। বার্ড ফ্লু'র সময় সরকার অসংখ্য খামার ধ্বংস করেছে। কিন্তু সেগুলি যেন আবার গড়ে উঠতে পারে তার জন্য সামান্যতম কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি তারা। নতুন করে ব্যবসা শুরুর কোন অবলম্বনও দেয়া হয়নি। এভাবেই প্রকারান্তরে এ শিল্পটিকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অপতৎপরতা চলছে।

চট্টগ্রামে নেশাগ্রস্ত পুত্রের ভয়ে মধ্যরাতে থানায় পিতা

নেশাগ্রস্ত সন্তানের দায়ের কোপ থেকে বাঁচতে মধ্যরাতে থানায় আশ্রয় নিলেন এক হতভাগ্য পিতা। তার আকুতিতে পুলিশ গ্রেফতার করে নেশাগ্রস্ত ছেলেকে। গত ১০ই ডিসেম্বর মধ্যরাতে চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানায় ঘটে এ ঘটনা।

অসহায় পিতা হ'লেন চট্টগ্রামে বন বিভাগের ফরেস্টার শাহাদাত হোসাইন। এলাকায় বখাটে হিসাবে পরিচিত নিয়মিত মাদক সেবনকারী ছেলে সুজাউদ্দৌলা তুষার (২০) নেশার টাকার জন্য সবসময় তার বাবাসহ পরিবারের লোকজনকে নির্যাতন করে। এছাড়া মাদক সেবন করে এসেও ঘরের মধ্যে সে অশান্তি সৃষ্টি করে। সম্প্রতি তুষার তার পিতাকে বেধড়ক মারধর করে। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার বিষয়টি জানার পর সে দা নিয়ে বাসায় তার পিতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এ খবর পিতা জানতে পেরে বাসায় না ফিরে থানায় গিয়ে পুলিশের আশ্রয় নেন।

[ইসলামী অনুশাসন ও ইসলামী বিধানের বাস্তবায়ন ব্যতীত এই সমস্যার কোন সমাধান নেই। সরকার কি সেদিকে নযর দিবেন? (স.স.)]

বিদেশ

যুক্তরাজ্যে ক্রীতদাসের সংখ্যা ১৩ হাযার! যৌন নির্যাতনের শিকার ১ কোটি ১০ লাখেরও বেশী শিশু

যুক্তরাজ্যে ক্রীতদাসের সংখ্যা ১৩ হাযার। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে ক্রীতদাসের জীবন কাটাচ্ছে অন্তত ১০ হাযার থেকে ১৩ হাযার মানুষ। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বেশী বলে মন্তব্য করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এদের মধ্যে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হওয়া নারী, বন্দী গৃহকর্মী, কারখানার শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া দেশটিতে আটক প্রায় ১০০টি দেশের নাগরিক, যারা জেলে বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রম করে, তাদেরও ক্রীতদাস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। প্রতিবেদন বিষয়ে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব টেরেসা মে বলেন, নির্মম বাস্তবতা হ'ল যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর সর্বত্র দাসত্ব রয়ে গেছে। দেশের ভেতর ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আধুনিককালের এ দাসত্বের বিরুদ্ধে সমন্বিত ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়। বিষয়টি মোকাবেলায় বেশ কিছু কৌশল হাতে নিয়েছে যুক্তরাজ্য।

অন্যদিকে সরকারের একজন উপদেষ্টা বলেছেন, যুক্তরাজ্যে যৌন নির্যাতিত শিশুদের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখেরও বেশী। বিশেষজ্ঞরা এটাকে একটি 'জাতীয় স্বাস্থ্য মহামারী' হিসাবে আখ্যায়িত করছেন। শিশু যৌন নির্যাতন বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষ প্যানেল তদন্তে নিয়োজিত উইলমার বলেন, ১৬ বছরের নিচে প্রতি ৬ জন বালকের ১ জন যৌন নির্যাতিত হচ্ছে। বালিকাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৪ জনে ১ জন।

[ইসলামী বিধান ও পরকালীন চেতনা সৃষ্টি করা ব্যতীত এই সমস্যা মুকাবিলার কোন পথ নেই। অতএব হে বৃটিশ নেতৃবৃন্দ! নিজেরা ইসলাম কবুল কর এবং দেশে ইসলামী বিধানসমূহের বাস্তবায়ন ঘটাও (স.স.)]।

বিস্ময়কর ভাষা পণ্ডিত

টিমোথি ডোনার ২৩টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইতহাসের জীবন্ত কিংবদন্তিদের পাতায় নাম লিখিয়েছেন। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ যেখানে মাতৃভাষা বাদে দ্বিতীয় কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জনেই হিমশিম খান, সেখানে ২৩টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন নিঃসন্দেহে গৌরবের। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাসিন্দা মাত্র ১৬ বছর বয়সী টিমোথি ডোনার হিব্রু-আরবী থেকে শুরু করে সোয়াহিরি-চাইনিজসহ ২৩টি ভাষায় হরদম কথা বলতে পারেন। এজন্য টিমোথি কৌতুক করে নিজেকে ভাষার বাগান বলে অভিহিত করে থাকেন। সবকিছু ছাপিয়ে আর যে বিষয়টি সবাইকে বিমোহিত করে তাহ'ল, নিজের প্রচেষ্টায় টিমোথি এসব ভাষা শিখেছেন। তিনি বলেছেন, ভাষা শিখতে তিনি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। টিমোথি আরো যেসব ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছেন তন্মধ্যে ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, মান্দারিন, জাপানী, ফারসী, পশতু ও হিন্দি অন্যতম।

সাপের পেটের মধ্যে ঢুকে জীবন্ত ফিরে এলেন পরিবেশবিদ পল রোসোলি!

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর সাপ অ্যানাকোন্ডার পেটের মধ্যে গিয়ে ঘুরে এলেন পরিবেশবিদ পল রোসোলি। আমাজনের জঙ্গলে গিয়ে এমনই কাণ্ড ঘটালেন তিনি। ক্যামেরা নিয়ে অ্যানাকোন্ডার পেটের ভিতর ছবিও তুললেন। 'আমাজনের জঙ্গল দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে' এই বিষয়ে গোটা বিশ্বকে অবগত ও সচেতন করতেই এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালেন পল। অ্যানাকোন্ডার ডিনার হয়ে নিজের পারদর্শিতাতেই বেঁচে ফিরলেন। কিন্তু কীভাবে? ক্যামেরা থেকে উদ্ধার হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ধরনের কার্বন ফাইবার স্যুট পরে সাপের পেটে প্রায় ৪৫ মিনিট থাকার পর সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন তিনি। স্যুটের গায়ে লাগানো ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়ল অ্যানাকোন্ডাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন পল। আমাজনের গভীর জঙ্গলে টানা ৬০দিন ঘাঁটি করে পড়ে থাকার পর ২০ ফুট লম্বা এক মেয়ে অ্যানাকোন্ডার পেটের মধ্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পল। দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে আমাজনের বন্যপ্রাণী রক্ষার আন্দোলনে লড়ছেন তিনি।

বাড়তি ওযন মোকাবিলায় নতুন রাসায়নিক আইপিই

ওযন বেড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় অনেকেই মন ভরে বা সন্তুষ্টি নিয়ে খেতে পারেন না। তাঁদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছেন যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক। আইপিই নামের রাসায়নিক উপাদানসমৃদ্ধ খাবার পরিমিত খেলে পূর্ণ সন্তুষ্টি মিলবে। ফলে থাকবে না ওযন বেড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা। গবেষকদের দাবী, খাবারের সঙ্গে একটি বিশেষ রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে দিলে তা অল্প খেলেই মন ভরে খাওয়ার অনুভূতি পাওয়া যাবে। ফলে শরীরে বাড়তি ক্যালরী যোগ হয়ে স্থূলতার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে। তারা সেই রাসায়নিক উপাদানটি তৈরীও করেছেন। আইপিই হচ্ছে প্রোপিয়নেট বা প্রোপানয়েট নামক লবণের গুঁড়া। এটি এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ ঘটাতে সহায়তা করে, যার প্রভাবে মানুষের মনে হয় যথেষ্ট পরিমাণ খাওয়া হয়েছে। তবে গবেষকরা বলছেন, এ রাসায়নিক উপাদান মানুষের ক্ষুধার নিয়ন্ত্রক হরমোনের নিঃসরণ ঘটিয়ে খাবার গ্রহণ কমায় ঠিকই। তবে শরীরের বড় পরিবর্তন চাইলে আইপিইর পাশাপাশি বেশি করে আঁশ-জাতীয় খাবার খেতে হবে।

ভারতে ৩০০ মুসলিমকে ধর্মান্তরকরণ!

ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু হলে মুসলমানরা পাবেন ৫ লাখ আর খ্রিস্টানরা পাবেন ২ লাখ রুপি করে। টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটেছে ভারতে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে জোর করে ধর্মান্তর করা এক নারী। অভাবের তাড়নায় হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত হন আগ্রার দেবনগরের ৩০০ দরিদ্র মুসলমান। সোমবার ৬০টি মুসলিম পরিবারের এই সদস্যদের ধর্মান্তরিত করে আরএসএসের দুই শাখা বজরঙ্গ দল ও ধর্ম জাগরণ মঞ্চ। ধর্ম জাগরণ মঞ্চের নেতা রাজেশ্বর সিং এ অর্থ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে স্কুলে হামলায় নিহত ১৪১

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় পেশোয়ারের ওয়ারসাক রোডে সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি স্কুলে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে একদল আত্মঘাতী চরমপন্থী। গত ১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে যখন হামলা চালানো হয়, তখন ঐ স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। তাই ৫০০ শিক্ষার্থীর সকলেই উপস্থিত ছিল। হামলায় প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ১৪১ জন। তাদের মধ্যে শিশু ১৩২ জন। বাকি ৯জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী। আহতের সংখ্যা ১২৫ এবং অনেকের অবস্থাই সংকটাপন্ন। পরে সেনাবাহিনী সামরিক অভিযান চালিয়ে অধিকাংশকেই বের করে আনে।

পাকিস্তানী কর্মকর্তারা জানান, হামলাকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর পোশাক পরে অতর্কিতে স্কুলে হামলা চালায়। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয় হামলাকারীরা সবাই। স্কুলভবনের ভেতর বোমা পেতে রাখায় স্কুলটির পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিতে নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ বেগ পেতে হয়। স্কুলের কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শী মুদাচ্ছির আওয়ান বলেন, 'আমরা দেখলাম, ছয়জন লোক স্কুলের দেয়াল বেয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল, তাদের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ গোলা ও অস্ত্রশস্ত্র। দেয়াল টপকে স্কুলে ঢুকেই তারা গুলি ছোড়া শুরু করে। আমরা দৌড়ে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পড়ি। এরপর তারা এক একটা শ্রেণীকক্ষে ঢুকে শিশুদের হত্যা শুরু করে। কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, প্রাণে বাঁচতে তারা বেঞ্চের নিচে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু যারাই নড়াচড়া করছিল, তাদেরই মাথা ও পায়ে গুলি করে হামলাকারীরা।

সেনাবাহিনীর বরাতে জানা যায়, এক শিক্ষকের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এক হামলাকারী। ঐ শিক্ষক জীবন্ত পুড়ে মারা যান। সেই দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয় তাঁর ছাত্রদের।

হামলায় এত শিশুর প্রাণহানিতে দেশজুড়ে এক নযীরবিহীন শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ রকম অমানবিক ও বর্বর হামলার নযীর আর নেই। বিশ্বেও এ ধরনের হামলা বিরল। স্কুলটির অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই সেনাসদস্যদের সন্তান।

হামলার দুই ঘণ্টা পরই দায় স্বীকার করে তাহরীক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)। সংগঠনটির মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী বলেন, 'উত্তর ওয়াযীরিস্তান ও খাইবার এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানের জবাবে এই হামলা। এতে আমাদের স্বজন হারানোর বেদনা তারাও বুঝতে পারবে'।

তবে এ বর্বর হামলার নিন্দা জানিয়েছে আফগান তালেবান। নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা ইসলাম পরিপন্থী কাজ আখ্যায়িত করে তারা বলেন, সজ্ঞানে নিরপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা ইসলামী নৈতিকতার বিরোধী। প্রত্যেক ইসলামী

সরকার ও আন্দোলনকে মৌলিক এ নীতি মেনে চলতে হবে।

[আমরা এই বর্বরতম ও মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে হঠকারিতা পরিহারের আহ্বান জানাই (স.স.)]

তুরস্কে আবার আরবী বর্ণমালা বাধ্যতামূলক করা হবে

-এরদোগান

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান তার দেশের হাইস্কুলে পুনরায় আরবী বর্ণমালা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। মুছতফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে কট্টর সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার অংশ হিসাবে ১৯২৮ সালে অটোম্যান যুগের আরবী বর্ণমালা বাতিল করে ল্যাটিন বর্ণমালার প্রবর্তন করেন। তবে এরদোগানের পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে তুরস্কের সেক্যুলাররা। এর জবাবে এরাদোগান বলেছেন, তারা পসন্দ করুক আর না করুক, এদেশে অটোম্যান বর্ণমালা ও ভাষা শিক্ষা দেয়া হবেই। এক পর্যায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, অটোম্যান ভাষা বাতিল করে দিয়ে আতাতুর্ক তুরস্কের ঘাড় কেটে দিয়েছিলেন। ঐ সমাধিতে ইতিহাস এখন ঘুমাচ্ছে। এটা জানার চেয়ে বড় দুর্বলতা আর কি হতে পারে? তিনি বলেন, একজন জার্মান নাগরিকও যেখানে অটোম্যান ভাষা শিখতে পারেন, সেখানে এখানকার ব্যাপারটা অন্যরকম (অটোম্যান ভাষা নিষিদ্ধ)।

বাহরাইনে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করছে ব্রিটেন

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে ব্রিটেন বাহরাইনে একটি স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সৃষ্ট হুমকির প্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে ১৯৭০ দশকের পর এই প্রথম এ অঞ্চলে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হবে। বাহরাইনের রাজধানী মানামায় শনিবার অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্মেলনে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করে যে, ব্রিটেন বাহরাইনের মিনা সালমান বন্দরে স্থল স্থাপনা বৃদ্ধি করবে।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাইকেল ফ্যালন বলেন, তার দেশ এখন পুনরায় দীর্ঘমেয়াদে উপসাগরে অবস্থান করবে। বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খালিদ আল-খলীফা এ প্রসঙ্গে বলেন, এ চুক্তি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় আমাদের যৌথ সংকল্প পুনঃনিশ্চিত করেছে।

[খাল কেটে কুমীর ঢুকানোর পরিণাম ভাল হবেনা। অতএব হে বাহরাইনের নেতৃবৃন্দ! নিজেদের গদীর স্বার্থে দেশের ও ইসলামের ক্ষতি করবেন না (স.স.)]

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃষিকাজের জন্য ড্রোন

যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর সোনোমা ভ্যালিতে কৃষক রায়ান কাণ্ডির পারিবারিক আঙ্গুর ক্ষেতটি দেখতে ছবির মতোই নিখুঁত। বিশাল ক্ষেতটি রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে পর্যবেক্ষণের সার্বিক কাজ সারেন ড্রোন দিয়েই। শুধু তিনিই নন, তাঁর মতো অনেক মার্কিন কৃষকই এখন ড্রোন ব্যবহার করেন। একসময়ের অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির ড্রোনের ব্যবহার এখন এভাবেই কৃষিকাজে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ড্রোনের তোলা ছবি এবং এতে থাকা শনাক্তকরণ যন্ত্রে সংগৃহীত তথ্য থেকে ফসলের জন্য সিদ্ধান্ত নির্ভুলভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে এই ড্রোন হ'ল ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রসমৃদ্ধ স্বল্পমূল্যের এক উড়ুক্কু যান, যা দেখতে অনেকটা ছোট উড়োজাহাজের মতো। বেতার-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত প্রথাগত একটি ড্রোনকে পরিচালনা করে থাকেন ভূমিতে থাকা একজন পাইলট। তবে কিছু ড্রোন অটোপাইলটের মাধ্যমেও চলে। প্রয়োজনীয় ওড়ার পথ ঠিক করে দেয় ড্রোনে থাকা সফটওয়্যার।

খুবই সামান্য খরচের এই ড্রোন ব্যবহার করে আকাশ থেকে দেখার কারণে ক্ষেতের পানি সেচ থেকে শুরু করে মাটির গুণাগুণের মতো বিষয়গুলো বোঝা সহজ হয়। এমনকি কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে পড়া বা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিও জানা যায়, যা খালি চোখে বুঝা যায় না। এছাড়া ছবি দেখে ক্ষেতের ফসলের প্রকৃত অবস্থা (কোনটি স্বাস্থ্যবান বা দুর্দশাগ্রস্ত) বোঝা যায়, যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব।

উকিলের দিন শেষ!

২০৩০ সাল নাগাদ আইনজীবীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'তে শুরু করবে। আইনজীবীদের জায়গা নেবে বুদ্ধিমান রোবট। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, বুদ্ধিমান রোবটের কারণে শিগগিরই আইন পেশাজীবীদের অন্য পথ খুঁজতে হবে। কারণ ২০৩০ সাল পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যায়, আইনজীবীদের সে সময় খুব বেশি প্রয়োজনই পড়বে না।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, বুদ্ধিমান একটি রোবটই এক ডজনেরও বেশী জুনিয়র আইনজীবীর সমান কাজ করতে পারবে। এ কাজের জন্য আইনী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ সুবিধা হবে। আলাদা করে বেতন দিতে হবে না। এ ছাড়া একটানা কাজ করে যেতে পারবে এই রোবট।

২০৩০ সাল নাগাদ বড় বড় আইনী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ব্যবসা মডেল যুক্ত করবে। অবশ্য বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বড় ধরনের প্রভাব পড়লেও ছোট ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের প্রভাব কম পড়তে পারে বলেই ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : সিরাজগঞ্জ

ইসলামের সরল পথে ফিরে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সিরাজগঞ্জ ২১শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে শহরের রহমতগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলন প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরল পথ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ এবং তা হ'তে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানী দর্শন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহূদী দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শন আদৌ কোন সরল পথের অনুসরণ নয়। অতএব সার্বিক জীবনে তাওহীদ কবুল করাই হ'ল পরকালীন মুক্তির পথ।

রহমতগঞ্জ পঞ্চায়েত কমিটির সদস্য জনাব মুঈনুদ্দীন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ-এর খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, সভাপতি ছাহেব তাঁর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট 'আন্দোলন'-এর প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে শহরে একটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান সহ তা নির্মাণের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে ওয়াদা করেন। আমীরে জামা'আত এজন্য তাঁকে প্রাণখোলা দো'আ করেন।

উপযেলা সম্মেলন : তেরখাদা

আসুন! পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

তেরখাদা, খুলনা ২৬শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার তেরখাদা উপযেলার উদ্যোগে উপযেলা সদরের ইখড়ি-কাটেঙ্গা হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পরকালে মুক্তির লক্ষ্যেই আমাদের যাবতীয় আন্দোলন। মানুষ দুই দলে বিভক্ত। একদল মানুষ তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা দুনিয়াবী কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করে। আরেকদল মানুষ তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা পরকালীন মুক্তির জন্য নিয়োজিত করে। যারা পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করে, তারাই প্রকৃত মুসলমান। আর যারা পরকাল ভুলে শুধু দুনিয়ার জন্যই কাজ করে তারা স্রেফ দুনিয়া পায় ও পরকাল হারায়। তিনি বলেন, যারা মুসলিম তাদের সকল কাজের লক্ষ্য থাকবে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া। অতএব সকল কাজে পরকালে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করুন। তিনি বলেন, আখেরাতে মুক্তির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল দুনিয়াতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সকল আদম সন্তানকে সেপথেই আহ্বান জানায়। যাতে মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হাত কামড়ে না বলে যে, কেন দুনিয়ায় থাকতে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পথ অনুসরণ করিনি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফীরোয আহমাদ।

মসজিদ উদ্বোধন : পরদিন বাদ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপযেলা সদরে নবনির্মিত *তেরখাদা উপযেলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স* উদ্বোধন করেন। উক্ত মসজিদে ফজর ছালাত শেষে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মসজিদ নির্মাণ করা সহজ, কিন্তু আবাদ করা কঠিন। মসজিদে নিয়মিত ছালাত আদায় যেমন যরূরী, তেমনি মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নও যরূরী। তিনি অত্র মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রতিদিন বাদ এশা একটি করে হাদীছ পাঠ এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক চালু করার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি অত্র মসজিদের প্রতিবেশী ও জমিদাতা মুসাম্মাৎ আবেনুর বেগমের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন এবং তার জন্য খাছ করে দো'আ করেন। এ সময় মসজিদ কমিটির সভাপতি খান তৈয়বুর রহমান, অর্থ সম্পাদক আবুল বাশার সহ অন্যান্য মুছল্লীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসা পরিদর্শন : সকাল ৭-টায় আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে তেরখাদা সরকারী রেস্ট হাউস থেকে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি বিভিন্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মাদরাসা ও প্রবীণ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। প্রথমে তিনি নাচুনিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, অতঃপর নাচুনিয়া পশ্চিমপাড়া চার গম্বুজ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, জুনারী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, নাচুনিয়া-জুনারী দাখিল মাদরাসা, জুনারী দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গাযীপুর দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা এবং কোদলা-কুমিরডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন। মসজিদ ও ওযূখানাগুলির অধিকাংশ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মাধ্যমে নির্মিত অথবা পুনর্নির্মিত। এ সময়ে তিনি তেরখাদা অঞ্চলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র প্রবীণ খাদেম আমীরে জামা'আতের মরহূম পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর ছাত্র

Contents

মাওলানা সেকেলুদ্দীন, জুনারী দাখিল মাদরাসার সাবেক সভাপতি প্রবীণ আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব খান মুহাম্মাদ আলী ও ১০৬ বছরের বৃদ্ধ খাদেম জনাব আব্দুল জলীল মণ্ডলের সাথে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, জনাব আব্দুল জলীল এই বয়সেও নাচুনিয়া পশ্চিমপাড়া চার গম্বুজ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুওয়াযযিন এবং এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নিরলস কর্মী। আমীরে জামা'আতের মরহূম পিতার মহব্বতে তিনি খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সাধ্যপক্ষে সর্বদা যোগদান করেন। আশ্চর্যের বিষয়, শৈশবে এতদঞ্চলে আব্বার সঙ্গে ভ্রমণকালে আমীরে জামা'আত কৌতূহলবশে স্থানীয় চিত্রা নদীতে একাকী নৌকা চালাতে গিয়ে ভাটির টানে হারিয়ে গিয়েছিলেন। পরে লোকেরা বহুদূর গিয়ে অনেক কষ্টে তাঁকে মাঝ নদী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

এ সময়ে আমীরে জামা'আতের সাথে তাঁর সফরসঙ্গী ছাড়াও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলী আকবর, সহ-সভাপতি আব্দুর রহীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফীরোয আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী, প্রচার সম্পাদক মাহমূদুল হাসান, অর্থ সম্পাদক শেখ মুফীদুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত উক্ত মসজিদ-মাদরাসা সমূহ পরিদর্শনের সময় উপস্থিত জনগণ এবং 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-র কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি কোন কোন মসজিদের মিহরাবের উপরে কালেমা শাহাদত লিখা, কোথাও 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' খচিত, কোথাও কা'বাগৃহের বা হারাম-এর স্তম্ভসমূহের নকশাকৃত টাইলসসমূহ সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানান। তিনি প্রত্যেক মসজিদের আলমারীতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই ও পত্রিকা রাখার জন্য বলেন এবং প্রতিদিন বাদ এশা হাদীছ শুনানো ও সপ্তাহে একদিন কেন্দ্রের নিয়মানুযায়ী তা'লীমী বৈঠক চালু করার আহ্বান জানান। তিনি কর্মীদেরকে বাযারের ব্যবসায়ী ভাইদের নিকটে গিয়ে তাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার পরামর্শ দেন।

<u>উপযেলা সম্মেলন : কলারোয়া</u>

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি নিহিত

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৭শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কলারোয়া উপযেলা সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় পাইলট হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত কলারোয়া উপযেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ধর্মনেতা বলতে আমরা যা বুঝি, সে অর্থে নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অতএব আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাঁর আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার মধ্যেই মানব জাতির মুক্তি নিহিত রয়েছে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ রবীউল হক। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম ও স্থানীয় শিল্পী মুহাম্মাদ ওমর আলী, আবু রায়হান ও বুরহানুদ্দীন। কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয তাওহীদুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক ও কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আনোয়ার এলাহী।

<u>যেলা সম্মেলন : খুলনা</u>

আল্লাহ্‌র দীদার চাইলে দুনিয়া থেকেই পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

হাদীছ পার্ক, খুলনা ২৮শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে মহানগরীর এতিহ্যবাহী হাদীছ পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। মানুষের দুঃখ-বেদনার সাথী ছিলেন বলেই তিনি মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও শরী'আত অনুমোদিত সৎকর্ম ব্যতীত পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করা সম্ভব নয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, খুলনা মহানগরীর জিন্নাহপাড়া শাখার সভাপতি মাওলানা আযীযুর রহমান ছিদ্দীকী ও মাওলানা যাকারিয়া (বাগেরহাট) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

জুম'আর খুৎবা :

সাতক্ষীরা থেকে সকালে রওয়ানা হয়ে খুলনা পৌঁছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। জুম'আর খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। তিনি বলেন, আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের স্ব স্ব জীবন ও পরিবার গড়ে তুলি। অতঃপর জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারের চেষ্টা করি।

Contents

<u>যেলা সম্মেলন : কুষ্টিয়া</u>

আসুন! আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে মানবীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১লা ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার কুমারখালী থানাধীন আলাউদ্দীন নগর ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পিতা আদম (আঃ)-এর যুগে পৃথিবীর সকল মানুষ এক দলভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে মানুষ হঠকারিতাবশে আল্লাহ্র কিতাবসমূহে মতভেদ করে। ফলে সবাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে এলাহী কিতাব রয়েছে মাত্র কুরআন মজীদ। অতএব এর ভিত্তিতেই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এর ফলে বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইন, আব্দুল মুমিন (মেহেরপুর), স্থানীয় ব্যক্তিত্ব জনাব গোলাম কুদ্দূস প্রমুখ।

<u>যেলা সম্মেলন : পাবনা</u>

হে মানুষ! পার্থিব জীবন ও শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

টাউন হল, পাবনা ৩রা ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্যবাহী টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের সার্বিক দুর্দশার জন্য দায়ী হ'ল আমাদের বস্তুবাদী চিন্তাধারা। অতএব সর্বাগ্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে আখেরাতমুখী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। জীবনের সংক্ষিপ্ত সফরসূচী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, আমরা এসেছি আল্লাহ্র কাছ থেকে। আবার ফিরে যাব তাঁর কাছে তাঁর হুকুমে। যেকোন সময় এই সফরের পরিসমাপ্তি ঘটবে। অতএব শয়তান যেন আমাদের মূল গন্তব্য থেকে প্রতারিত না করে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)।

<u>যেলা সম্মেলন : নরসিংদী</u>

ঈমানদার ও সৎকর্মশীল মানুষ হ'ল সৃষ্টিজগতের সেরা

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ঈমানহীনদের সৎকর্ম কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ সেগুলি 'বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা স্বরূপ' করে দিবেন। অতএব আসুন! কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি ছাড়াই স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাই। পথভোলা মানুষকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, যেলার মাধবদী বাজারের এসপি ইনস্টিটিউশন ময়দানে যেলা সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত ছিল এবং প্রশাসন নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিখিত অনুমতিপত্র দিয়েছিল। প্যান্ডেল ও প্রচারণা সহ সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন ছিল। কিন্তু একটি বিরোধী ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের ষড়যন্ত্রে সম্মেলনের পূর্ব রাত ১১-টার সময় যেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে অনুমতি বাতিল করা হয়। জানা যায়, উক্ত বিদ'আতী সংগঠনের পক্ষ থেকে যেলা প্রশাসক বরাবরে সম্মেলন বন্ধের আবেদন করা হয় এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য সমূহ উপস্থাপন করা হয়। এমনকি তারা স্থানীয় কয়েকটি মসজিদের মুছল্লীদেরকে উসকানী দিয়ে জুম'আর পরে সম্মেলনের বিরুদ্ধে মিছিল বের করার জন্য উত্তেজিত করে। পরিস্থিতি নেতিবাচক মনে করে প্রশাসন সম্মেলনের অনুমতি বাতিল করে দেয়। অতঃপর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্শ্ববর্তী পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সম্মেলনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

জুম'আর খুৎবা : এদিন পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এজন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাদেরকে সাত বছরে ছালাতের আদেশ দেওয়া ও দশ বছরে তাদের এজন্য প্রহার করা ও বিছানা পৃথক করে দেওয়ার হাদীছ শুনিয়ে ইসলামের বাস্তব নৈতিক প্রশিক্ষণের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে 'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সকলকে এর মাধ্যমে তাদের শিশু-কিশোরদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

<u>যেলা সম্মেলন : ময়মনসিংহ</u>

তাওহীদ বিশ্বাস ও নেক আমল দুনিয়াতে পবিত্র জীবন লাভের পূর্বশর্ত

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ৬ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে

ত্রিশাল থানাধীন নওধার চকপাঁচপাড়া ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার জন্য আল্লাহপাক মানুষকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা কি পারি না আমাদের সমাজকে সুন্দর করার স্বার্থে আল্লাহ্র উক্ত আহ্বানে সাড়া দিতে? 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানুষকে সে পথেই আহ্বান জানায়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাতেম বিন পারভেয, ময়মনসিংহ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহিল কাফী, মাওলানা শিহাবুদ্দীন, মাওলানা রূহুল আমীন ও মাওলানা সফীরুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান (ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ)।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ জনাব মোশাররফ হোসাইন ছাহেবদের উদ্যোগে নবপ্রতিষ্ঠিত নওধার ইসলামিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা পরিদর্শন করেন এবং এর উন্নতির জন্য দো'আ করেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন : আগের দিন নরসিংদী যেলা সম্মেলন শেষ করে পরদিন আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বেলা ১২-টায় ময়মনসিংহ শহরে পৌঁছে তিনি প্রথমে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদরূপ তত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. একিউএম বযলুর রশীদ। তিনি আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রজেক্ট, ফ্যাকাল্টি, জার্ম সেন্টার, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখান। এ সময়ে ভাষা বিভাগের ইংরেজী প্রভাষক আরীফুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কর্মী মাহদী হাসান, তাওহীদুল ইসলাম, যোবায়ের হোসাইন, মুহাম্মাদ হোসাইন, মুহাম্মাদ আলী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সুধী সমাবেশ : অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে শহরের গোলপুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ যোগদান করেন। উক্ত মসজিদ কমিটির সভাপতি স্থানীয় প্রবীণ আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ মালিক মুহাম্মাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি সমাজ সংস্কার আন্দোলন। সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার সমূহ দূর করা এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ গঠন করাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। তিনি সকলকে এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ঐক্য এবং পারস্পরিক ভালোবাসাই হ'ল সামাজিক ঐক্যের মানদণ্ড। অতএব মনের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে বাইরের দুয়ার আপনা থেকেই খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান, কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল্লাহ প্রমুখ। আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গীগণ এসময় সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে সকলের সাথে পরিচিত হন।

যেলা সম্মেলন : টাঙ্গাইল

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বাসাইল, টাঙ্গাইল ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টা থেকে সন্ধ্যা ৫-টা পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে বাসাইল উপযেলাধীন কাঞ্চনপুর ঢংপাড়া চৌরাস্তা মোড় সংলগ্ন উন্মুক্ত ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, সার্বিক জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলার মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৮১, ৮০ ও ৫ দিন পূর্বের তিনটি অছিয়ত এবং মৃত্যুমুহূর্তের সর্বশেষ অছিয়তগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে সেগুলির যথাযথ অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানব জীবনকে আল্লাহ্র সর্বশেষ অহী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তোলার আন্দোলনই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার আব্দুল ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মাজেদ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক শিহাবুদ্দীন আহমাদের পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক শিহাবুদ্দীন আহমাদ পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। গত ২৯শে নভেম্বর'১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৬তম সিন্ডিকেট সভা তাকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল **'মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী : ফিক্বহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান'**। তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে ২০০৩ সালে বি.এ (অনার্স) এবং ২০০৫ সালে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন কালাইহাটা গ্রামের বাশিন্দা। তিনি সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : কোন কোন সময় সালাম দেওয়া বা নেওয়া নিষিদ্ধ?

-সজল, হারুপুর, রাজশাহী।*

উত্তর : সালাম সর্বাবস্থায় আদান-প্রদান করা যায়। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থাতেও হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন *(আবুদাঊদ হা/৯২৬, তিরমিযী হা/৩৬৭, মিশকাত হা/৯৯১)*। কেবল পেশাব-পায়খানার সময় তিনি সালামের উত্তর দিতেন না, বরং বের হয়ে উত্তর দিতেন (যদি সেই ব্যক্তি মওজুদ থাকত) *(বুখারী হা/৩৩৭, আবুদাঊদ হা/১৭, মিশকাত হা/৪৬৭, ৫৩৫)*।

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন ও সেই নামে ডাকুন (স.স.)]*।

প্রশ্ন (২/১২২) : মুসলিম মৃতব্যক্তির কাফন-দাফন কার্যে কোন হিন্দু অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?

-আব্দুল মুত্তালিব
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মুমিনের কাফন-দাফন সম্পন্ন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। মুসলমানগণ নেকীর আশায় উক্ত কাজে শরীক হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাল। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখল, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন' *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৫; ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৯২, সনদ ছহীহ)*। কিন্তু হিন্দু বা অমুসলিমদের উক্ত নিয়ত থাকে না। তবে সাধারণভাবে তারা ছোট-খাট যেকোন সহযোগিতা করতে পারে।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : আমাদের মসজিদের ইমাম জুম'আ ব্যতীত কোন ছালাত আদায় করে না এবং সিগারেট-জর্দা-গুল ব্যবহার করে। তাকে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ
মাটিয়ানী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ইমাম যদি জুম'আ ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত তরককারী হয়, তবে তার পিছনে ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত' *(মুসলিম হা/১৩৪, মিশকাত হা/৫৬৯)*। প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় ইমামকে নছীহত করতে হবে অথবা এড়িয়ে যেতে হবে। আর ঐ ইমামের ছালাত কবুল হয় না মুছল্লীরা যাকে শারঈ কারণে অপসন্দ করে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১২২, ২৮)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : অনেকে বলে থাকে যে, রাতের অন্ধকারে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়, বরং আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহসিন আলম, ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। আলো ছালাতের কবুল হওয়ার কোন শর্ত নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে অনেক সময় অন্ধকারে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৩৮২; মুসলিম হা/৫১২, মিশকাত হা/৭৮৬, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদে আলোর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। যাতে সাপ-বিচ্ছু বা অন্য কিছুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মুছল্লী সহজে জামা'আতে শরীক হ'তে পারে।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : মহিলারা ছালাত অবস্থায় পায়ের পাতা ঢেকে রাখবে কি?

-রায়হানা, পাবনা।

উত্তর : পর্দার মধ্যে মহিলা পরিবেশে প্রয়োজন নেই। অন্য সময়ে যথাসাধ্য ঢেকে রাখবে। কেননা দু'হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মহিলাদের সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : কথা কাটাকাটির কারণে এবং পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের কারণে ৬/৭ মাস যাবৎ বান্ধবীর সাথে কথা বলিনি। এক্ষণে এর জন্য কি আমি গোনাহগার হচ্ছি?

-রাশীদা, নাটোর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন দিনের বেশী কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলিম হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৩৫)*। অতএব মন থেকে দূরত্ব পরিহার করতে হবে এবং সম্ভবপর যেকোন মাধ্যমে দ্রুত তার সাথে যোগাযোগ করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নিতে হবে।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, কোন ব্যক্তি ওয়ায মাহফিলে যাওয়ার ইচ্ছা করে সামনের পা বাড়িয়ে পিছনের পা তোলার আগেই সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মাহবূব, শঠীবাড়ী, রংপুর।

উত্তর : এইরূপ শব্দে হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে নেকীর উদ্দেশ্যে পূর্ণ ইখলাছের সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ

ভিত্তিক কোন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করলে অসংখ্য নেকী পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও পাপ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন নেকী করার ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, আল্লাহ তার পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, তার আমলনামায় ১০ থেকে ৭শ'র অধিক নেকী লেখা হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'আল্লাহ্‌র রহমত প্রশস্ত' অনুচ্ছেদ, 'দো'আ' অধ্যায়)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হ'ল, আল্লাহ তাঁর জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*। তিনি বলেন, 'যখন কোন কওম আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য একত্রিত হয়ে বসে, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাশের ফেরেশতাগণের সামনে তাদের প্রশংসামূলক আলোচনা করেন' *(মুসলিম হা/২৭০০; ছহীহুল জামে' হা/৫৫০৯; মিশকাত হা/২২৬১)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : জনৈক দানশীল ধার্মিক ব্যক্তি কিছু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মারা গেছেন। বর্তমানে সেগুলিতে নাচ-গানসহ বিভিন্ন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। এক্ষণে এসব পাপের ভার কি কেবল বর্তমান পরিচালকদের না উক্ত প্রতিষ্ঠাতার আমলনামাতেও যুক্ত হবে?

-আব্দুল্লাহ
সোহাগদল, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তর : যেহেতু প্রতিষ্ঠাতা মারা যাওয়ার পর এসব কার্যকলাপ শুরু হয়েছে, সেহেতু তিনি এর জন্য দায়ী হবেন না। বরং বর্তমান পরিচালকগণ এর জন্য গুনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, 'একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। তবে যদি এগুলির পিছনে প্রতিষ্ঠাতার সমর্থন ছিল বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনিও দায়ী হবেন।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : আমার জানা মতে, হিন্দুরা যেমন সিঁদুর ব্যবহার করে স্বামীর মঙ্গলের জন্য, মুসলিমদের মাঝেও নাকফুল পরিধানের নীতি এরূপ কারণেই এসেছে। এক্ষণে মহিলাদের জন্য এটা ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভুল। কোন মুসলিম মহিলাই স্বামীর মঙ্গলের জন্য নাকফুল পরে না। বরং এটি নারীদের অলংকার বিশেষ। যা তারা তাদের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিধান করে থাকে। অতএব নাকফুল ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/৩৬)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫, আবুদাঊদ হা/৪০৫৭, মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। উল্লেখ্য, মেয়েদের কান ফুটানোর বিষয়টিও জায়েয আছে। জাহেলী যুগে এটা করা হ'ত। কিন্তু ইসলামী যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাতে কোন আপত্তি করেননি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ পৃঃ ২/৩৪)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : মৃত্যুবরণ করার পর মানুষের কোন আমল কি জারী থাকে?

-মান্না সরকার
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। (যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি)। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি)। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। (মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি)। *(মুসলিম হা/১৬৩১, মিশকাত হা/২০৩)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) কুরআন বিতরণ করা (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(মুসনাদ বাযযার হা/৭২৮৯; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০২)*। এটি পূর্বের হাদীছের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানত করা হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। এক্ষণে মানত আদায় করতে হবে কি? আর যে বস্তু দান করার মানত করা হয়েছিল তার পরিবর্তে সমমানের বস্তু দান করা যাবে কি?

-মি'রাজুল ইসলাম, কানাডা।

উত্তর : উদ্দেশ্য পূরণ না হ'লে মানত আদায় করতে হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৭৬৪২)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে, যার সে নিয়ত করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*। দ্বিতীয়তঃ যে জিনিসের মানত মেনেছে সেটাই আদায় করতে হবে, যদি তা আল্লাহ্‌র আনুগত্যপূর্ণ কাজ হয়ে থাকে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। সমমানের অন্য বস্তু দ্বারা আদায় করা যাবে না। না পারলে কাফফারা দিতে হবে। তা হ'ল দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একজন (মুমিন) ক্রীতদাস মুক্ত করা অথবা তিনদিন (একটানা) ছিয়াম রাখা *(মায়েদাহ ৮৯, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : গোসল কি ওযূর বিকল্প হ'তে পারে? কেউ যদি ভুলবশতঃ কেবল গোসল করে ছালাত আদায় করে, তবে তা কবুল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ছালাত কবুল হওয়ার জন্য ওযূ শর্ত *(মায়েদাহ ৫/৬)*। অতএব গোসল ওযূর বিকল্প হবে না। ওযূ না করে গোসল করলে ছালাতের জন্য পুনরায় ওযূ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়ু নিঃসরণের পর ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের ছালাত কবুল করবেন না *(বুখারী হা৬৯৫৪/, মুসলিম হা/২২৫)*। এছাড়া ওযূ করার পর সর্বাঙ্গ ধৌত করাই গোসলের সুন্নাতী নিয়ম *(বুখারী হা/২৪৮, মুসলিম হা/৩১৬, মিশকাত হা/৪৩৫)*। অতএব ওযূ ব্যতীত স্রেফ গোসল করে ছালাত আদায় করলে পুনরায় ওযূ করে তা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : যাকাত ফাণ্ডের অর্থ ছহীহ আক্বীদা আমলের প্রচারের স্বার্থে নির্মিত মসজিদের সম্প্রসারণ, ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যাবে কি?

-ডা. মানছূর আলী
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যাকাত বণ্টনের যেসব খাত উল্লেখ করেছেন, মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৯/৬০)*। অতএব যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৬, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৮)*। ইমাম বা মুওয়াযযিন অভাবগ্রস্ত হ'লে তাদেরকে দেওয়া যাবে। কিন্তু বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে না। স্মর্তব্য যে, ইমাম-মুওয়াযযিন হচ্ছেন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের দায়-দায়িত্ব সমাজের উপর ন্যস্ত। সুতরাং সমাজের লোকদের উচিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানজনক ভাতা বা বেতনের ব্যবস্থা করা *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : আল্লাহ তা'আলা একদিন জিবরীল (আঃ)-কে কয়েকটি শহর ধ্বংস করতে বললে তিনি ঘুরে এসে বললেন, শহরগুলির একটিতে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সহই শহরটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ, যা বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে *(শু'আবুল ঈমান হা/৭১৮৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১২১৫৬; মিশকাত হা/৫১৫২)*। এর সনদে উবায়েদ বিন ইসহাক্ব ও আম্মার বিন সাইফ নামক দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯০৪; হায়ছামী ও হাফেয ইরাক্বীও বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : আযানের সময় বিভিন্ন মসজিদের আযান শোনা যায়। এক্ষণে যেকোন একটির উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে, না সবগুলিরই উত্তর দিতে হবে?

-মূসা, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : একটির উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তদ্রূপ বল'... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়ায্যিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে..., সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*। উল্লেখ্য যে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার পরে 'ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : বিধর্মীদের সাথে অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসা করা যাবে কি?

-আযীম সরকার, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : নিজ ধর্ম যথাযথভাবে পালন সাপেক্ষে বিধর্মী কোন ব্যক্তির সাথে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে না, তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*। তিনি বলেন, 'তোমরা ভাল ও তাক্বওয়াশীল কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৪/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের জমি ও বাগান সেখানকার ইহূদীদেরকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৭২)*। খেয়াল রাখতে হবে যেন উক্ত ব্যবসায় কোনভাবে সূদ-ঘুষ বা লেনদেনের কমবেশী ও কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া হয়। কেননা এগুলি ইসলামী ব্যবসানীতির ঘোর বিরোধী।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের সময় আগত আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়নের জন্য মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে খাবার ব্যবস্থা করা বা টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে ব্যবস্থা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-কামরুল হাসান
আটগ্রাম, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়নের জন্য রান্না-বান্না করা যাবে না। বরং প্রতিবেশীরা বা আত্মীয়-স্বজন উক্ত পরিবারের জন্য রান্না করে খাওয়াবে। মুতার যুদ্ধে জা'ফর বিন আবু তালেব (রাঃ)-এর মৃত্যু খবর আসলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরী কর। কারণ তার পরিবার এখন শোকে কাতর *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩৯, ১৭৪৩)*। প্রত্যেক মুসলিম সমাজে এ সুন্নাতী আমল জারী রাখা অবশ্য কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, সমাজে মৃতব্যক্তির জানাযায় আগত সকলকে খাওয়ানোর রীতি চালু আছে, যা সুন্নাত পরিপন্থী। অতএব তা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : কুল, লিচু, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল পাকার সময় পাখিরা ক্ষতি করায় চাষীরা সুরক্ষার জন্য জাল টাঙিয়ে রাখে। কিন্তু তাতে পাখি বসে আটকা পড়ে এবং মারা যায়। এক্ষণে এরূপ জাল ব্যবহার করায় শরী'আতে বাধা আছে কি?

-আব্দুছ ছবূর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সম্পদ রক্ষার উপকরণ ব্যবহার করাতে ক্ষতিকারক যে কোন কীট-পতঙ্গ বা পশু-পাখী মারা গেলে তাতে তারা

দায়ী হবে না। কেননা প্রত্যেকেরই নিজের সম্পদ রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে ডাকাত বা ছিনতাইকারীকে হত্যা করা হ'লে নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। আর মালিক মারা গেলে সে শহীদ হবে *(মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : বাঘ বা এরূপ কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়ার তৈরী জ্যাকেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-তাজুল ইসলাম, গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তর : এরূপ পোষাক ব্যবহার করা যাবে না। মিক্বদাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) হিংস্র জন্তুর চামড়া পরতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪১৩১, মিশকাত হা/৫০৫)*। তিনি বলেন 'তোমরা রেশমী কাপড় এবং বাঘের চামড়ার তৈরী গদির উপর সওয়ার হয়ো না *(আবুদাঊদ হা/৪১২৯; নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৫৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব সকল প্রকার হিংস্র প্রাণীর চামড়া পোষাক বা বসার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : শরী'আতে বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা আছে কি?

-মাহতাবুদ্দীন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা বা ঔষধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি, যার আরোগ্যের কোন ব্যবস্থা দেননি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে রোগটি কি? তিনি বললেন, বার্ধক্য' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৩২, সনদ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ে অতি বার্ধক্য হ'তে পানাহ চেয়েছেন, *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুব্নে ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখ্লে ওয়া আ'উযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরে; ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে।* অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্টতম বয়স হ'তে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও কবরের আযাব হ'তে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন নামক তাফসীরটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রণীত কি?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : এ তাফসীরে কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল এবং বহু স্থানে ভুল তাফসীরের সমাবেশ ঘটেছে। ফলে একে বিশুদ্ধ তাফসীর বলা যায় না। এর মধ্যে উল্লেখিত ভুলগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল : (১) 'নবী' বা 'ওলী'র বরাত দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের নির্দেশ ও হাদীছের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে' *(পৃঃ ৯, ৩২৭)*। অথচ মৃত নবী বা অন্য কারুর অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক *(মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩)* (২) 'সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে'... এক হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন' *(পৃঃ ৪২৮)*। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল আক্বীদা এবং হাদীছটি জাল *(ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। (৩) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন।... এ কারণই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি' *(পৃঃ ১০৯৩)*। অথচ 'হায়াতুন্নবী'-র এই আক্বীদা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা *(যুমার ৩০)* (৪) 'কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তাক্বলীদ করা অপরিহার্য। সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য' *(পৃঃ ৭৪৩)*। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণই কেবল অপরিহার্য এবং মুজতাহিদ ইমামগণ ভুলের ঊর্ধ্বে নন (৫) 'আল্লাহ তা'আলার কোন আকার নেই' *(পৃঃ ১৪৬৫)*। অথচ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে অন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে যে, 'আমরা মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি'। এর অর্থ অনেকে করেছেন علي صورة الرحمن 'আল্লাহ্র আকৃতিতে'। অথচ আল্লাহ্র বাস্তব আকার (صورة متشخصة) কোথায় আছে ভাবার্থ ব্যতীত? *(ঐ, ২০/১১৪)*'। এ বিষয়ে সঠিক আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্র আকার আছে। কিন্তু তার তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ১১)*। (৬) 'এলমে তাছাউফও ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত' *(পৃঃ ৫৯৬)*। অথচ দ্বীনী ইলম হাছিল করা ফরয। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি। পৃথকভাবে ইলমে তাছাউওফের কোন অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। বরং কথিত ছূফীবাদের চোরাগলি দিয়েই মুলমানদের মধ্যে অধিকাংশ শিরক প্রবেশ করেছে (৭) অনুরূপভাবে সূরায়ে 'মুহাম্মাদ' ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সৈয়ূতীর বরাতে বলা হয়েছে যে, 'আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন' *(পৃঃ ১২৬৩)*। এমনিভাবে অসংখ্য শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমলের প্রচারণা চালানো হয়েছে অত্র তাফসীর গ্রন্থে। অতএব কেউ পড়তে চাইলে জ্ঞান-বিবেক জাগ্রত রেখেই এ তাফসীর পড়তে হবে। কেননা তার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ও রয়েছে।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব লিখিত মালফূযাত গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, 'যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ছাদাক্বা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না।' এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আলীম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উল্লিখিত মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলামী শরী'আতে যাকাত 'ফরয'। যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অবশ্যই তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(নূর ২৪/৫৬)*। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে ছালাতের পরেই

Contents

যাকাতের নির্দেশ এসেছে। ছহীহ হাদীছে যাকাতকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়েছে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য হাদিয়ার কথা বলেছেন মাত্র। পারস্পরিক 'হাদিয়া' প্রদান করা সুন্নাত। কাজেই যাকাতের 'ফরয' দরজা হাদিয়ার নিম্নে উল্লেখ করা নিতান্ত অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ যাকাত হ'ল ছাদাক্বা বা ফরয অনুদান। যা গ্রহণ করা বিশ্বনবী হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের জন্য মর্যাদাকর নয়। পক্ষান্তরে 'হাদিয়া' হ'ল উপঢৌকন। এতে মর্যাদা হানিকর কিছু নেই। সম্ভবতঃ সেকারণে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'হাদিয়া' হারাম করা হয়নি।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় যে দু'বার সালাম দেওয়া হয় তা কাকে দেওয়া হয়?

-আনোয়ারুল ইসলাম
বামনগ্রাম, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত আদায়কারী তার ডানে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদান করবে *(মুসলিম হা/৪৩১; ছহীহুল জামে' হা/৪০১৯)*। অতএব সালাম ফিরানোর সময় ডানে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদানের নিয়ত করবে। আর যদি একাকী ছালাত আদায় করে, তাহ'লে ডানে ও বামে থাকা ফেরেশতাদের সালাম প্রদানের নিয়ত করবে *(ইমাম নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৫৬, ৪৬২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩২৬, ৩২৭; শায়খ ওছাইমীন, শারহুল মুমতে' ৩/২০৮)*। সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণে এটা করা হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : প্রস্রাব শেষে দু'এক কদম হাঁটার পর সবসময়ই দু'এক ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হ'তে দেখা যায়। এক্ষণে টয়লেটের মধ্যেই টিস্যু নিয়ে দু'এক কদম হাঁটায় কোন বাধা আছে কি?

-এম. এ. রহমান
রাণীবাজার, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তর : এটা এক প্রকার রোগ। এর জন্য চিকিৎসা নিতে হবে। এক্ষত্রে সর্বশেষ ফোঁটা বের হয়ে আসা পর্যন্ত বসে থেকে পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর উঠবে। আর পানি না থাকলে ঢিলা অথবা টিস্যু ব্যবহার করবে *(তিরমিযী হা/১৬, ইবনু মাজাহ হা/৩১৬, সনদ ছহীহ)*। এরপরেও দু'এক ফোঁট নির্গত হ'তে দেখলে টয়লেটের ভিতরে থেকে প্রস্রাব হ'তে পবিত্র হওয়ার জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : সূরা ফাতিহার 'ওয়ালাযযাল্লীন' পাঠে ক্বারীগণের মতভেদ রয়েছে। এক্ষণে এরূপ উচ্চারণগত মতপার্থক্যের কারণে ছালাত বিনষ্ট বা গুনাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

-আব্দুল লতীফ, বগুড়া।

উত্তর : বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারী ক্বারীদের মাঝে 'ওয়ালাযযাল্লীন' পাঠের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। প্রতিটি আরবী অক্ষরের মাখরাজ বা নির্দিষ্ট উচ্চারণস্থল রয়েছে। আরবী অক্ষর মাখরাজ অনুযায়ী উচ্চারণ করতে হবে। 'যোয়াদ'-কে অন্য অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ করা হ'লে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফলে ছালাত বাতিল না হ'লেও ত্রুটিপূর্ণ হবে। অতএব আরবী হরফের মাখরাজ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে পড়া যরূরী। তবে ভুলক্রমে বা চেষ্টা করা সত্ত্বেও উচ্চারণ করতে না পারলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : জামা'আতবদ্ধ ছালাতে ইমাম অধিকহারে ভুল করলে মুক্তাদীদের করণীয় কি? এরূপ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-আব্দুল হাদী নাসীম
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ছালাতে ইমাম ভুল করলে মুক্তাদীদের কর্তব্য হ'ল লোকমা দিয়ে ভুলটি শুধরিয়ে দেওয়া *(আবুদাউদ হা/৯০৭, সনদ হাসান)*। আর শুধরানো সম্ভব না হ'লে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ছালাত বাতিল হবে না। আর ইমাম উদাসীনতার কারণে বার বার ভুল করলে এর গুনাহ তার উপরে বর্তাবে, মুক্তাদীর উপরে নয়। ছালাতে ভুলক্রমে কোন 'ওয়াজিব' তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে *(আস-সায়লুল জাররার ১/২৭৪ পৃঃ)*। কিন্তু ছালাতে ক্বিরাআত ভুল হ'লে বা সেরী ছালাতে ভুলবশত ক্বিরাআত জোরে বা তার বিপরীত হয়ে গেলে সহো সিজদার প্রয়োজন নেই।

স্মর্তব্য যে, ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া সফল মুমিনের বৈশিষ্ট্য *(মা'আরিজ ৭০/৩৪)*। আর ছালাতে উদাসীনদের জন্য রয়েছে 'দুর্ভোগ' *(মাঊন ১০৭/৫)*। অতএব ইমামদের কর্তব্য হ'ল পূর্ণ সচেতনতার সাথে ইমামতির দায়িত্ব পালন করা।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : তাশাহহুদে বসা অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে না আঙ্গুল নাড়ানোর দিকে রাখতে হবে?

-যাকারিয়া হাবীব, বগুড়া।

উত্তর : তাশাহহুদে বসা অবস্থায় দৃষ্টি রাখতে হবে আঙ্গুলের ইশারার দিকে। রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহহুদে বসতেন, তখন ...তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি আঙ্গুলের ইশারা বরাবর থাকত তার বাইরে যেত না। *(আবুদাউদ হা/৯৮৮, ৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখাই সুন্নাত *(নববী, শারহ মুসলিম হা/৯১০, নায়লুল আওতার ২/৩১৭)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : মসজিদে মুরগী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানতকৃত বস্তু জমা হ'লে এর হকদার ইমাম ছাহেব হবেন কি?

-মুহাম্মাদ সুলতান, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : মানতকৃত বস্তু মানতকারীর নিয়ত অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। এতে ইমাম ছাহেবের হক থাকার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : আমি পেনশন হিসাবে যে অর্থ পেয়েছি তা দ্বারা আমার জন্য হজ্জের ফরযিয়াত আদায় করা যরূরী না স্ত্রী-সন্তানদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা যরূরী হবে? সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে চাই।

-কামাল হোসাইন, পাংশা, রাজবাড়ী।

Contents

উত্তর : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এগুলি মানুষের মৌলিক চাহিদা। এক্ষণে যদি পরিবারের জন্য থাকার উপযোগী নিজস্ব কোন বাসস্থান না থাকে, তাহ'লে প্রথমে বাসস্থান নির্মাণ করবে। অতঃপর সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি দরিদ্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে, যেখানে তুমি শান্তি পেতে পার? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তোমার বাসস্থান আছে কি যেখানে তুমি আশ্রয় নিতে পার? লোকটি বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি ধনী *(মুসলিম হা/২৯৭৯, মিশকাত হা/৫২৫৭)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে পরবর্তীতে মারা গেছেন। তার মেয়েরাও ধার্মিক। এক্ষণে তার কোন মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

-মাহফূযুর রহমান, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : এরূপ মেয়েদের বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। বরং ধার্মিক মনে করলে তাদেরকেই বিবাহ করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)*। অবৈধ সম্পদ উপার্জনের জন্য পিতা দায়ী হবেন, সন্তানরা নয় *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : আমার ছোট বোন জনৈক লম্পট ছেলেকে পিতার সম্মতি ছাড়াই বিবাহ করে বাড়ি ছেড়েছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি? তার দৈনিক খরচ নির্বাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ এবং পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে কি? অথচ তা প্রদান করলেও উক্ত লম্পট ছেলেটি তা হারাম কাজে ব্যবহার করবে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আমীনুল সরকার
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ধর্মত্যাগ ও হত্যাকারী ব্যতীত সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কোন বিধান শরী'আতে নেই *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ মিশকাত হা/৩০৪৩, ৩৫০০)*। পিতা-মাতা একাজ করলে সন্তানের হক নষ্ট করা হবে, যা পরকালে নিজের নেকী থেকে তাকে পরিশোধ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*। এক্ষণে পিতার জন্য করণীয় হ'ল, দ্রুত সমাঝোতা করে নতুনভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করা অথবা মেয়েকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নারীদের বিবাহ জায়েয নয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩১)*। অথবা মেয়ে স্বামীর সাথে 'খোলা' করে ফিরে আসবে। কারণ এভাবে একত্রে অবস্থান করা যেনার শামিল।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতীদের ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ না করে দো'আয় শরীক হ'তে বলেছেন। এটা দ্বারা কি উক্ত ছালাতে সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণ হয় না?

-এ. কে. এম. আব্দুল খালেক
৮নং উপশহর, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ হ'ল, খুৎবা শ্রবণ করা, তা থেকে নছীহত গ্রহণ করা, উক্ত সমাগমে শরীক হয়ে তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ও তাসবীহে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সেকারণ উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী উম্মু আতিয়া (রাঃ) বলেন, আমাদের পর্দানশীন কুমারী হায়েযা মহিলারা ঈদের ময়দানে বের হ'তেন। অতঃপর লোকদের পিছনে অবস্থান করে তাদের সাথে তাকবীরে অংশগ্রহণ করতেন *(মুসলিম হা/৮৯০; ছহীহাহ হা/৬০০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অতঃপর মহিলারা পুরুষদের পিছনে থাকত, তারপর তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর ও তাদের দো'আর সাথে দো'আ করত এবং এই দিনের বরকত ও পবিত্রতার প্রত্যাশা করত' *(বুখারী হা/৯৭১)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'মুসলিমদের দো'আ বলতে সকলকে শামিল করে। উক্ত কথা দ্বারা ঈদের ছালাতের পরে দো'আ করা বুঝানো হয়, যেমনটি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শেষে করা হয়। অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ ঈদায়েনের ছালাতের পর দো'আ করা রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। আর কেউ তা বর্ণনাও করেনি। বরং তাঁর থেকে প্রমাণিত আছে যে, ছালাতের পরে খুৎবা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ করতেন না। সুতরাং 'দা'ওয়াতুল মুসলিমীন' দ্বারা উক্ত অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হবে। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল- যিকির-আযকার-দো'আ, বক্তব্য-নছীহত। কারণ দাওয়াত শব্দটি ব্যাপক' *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩১)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : নবী করীম (ছাঃ)-এর দেহে খাতমে নবুঅতের চিহ্ন কোথায় ছিল এবং তা কেমন ছিল? কোন কোন ছাহাবী তা চুমু দিয়েছিলেন বলে যা প্রচলিত রয়েছে। এর সত্যতা আছে কি?

-আতাউর রহমান, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ)-এর খাতমে নবুঅতের চিহ্ন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে ছিল। আর তা ছিল কবুতরের ডিমের মত *(মুসলিম হা/২৩৪৪; তিরমিযী হা/৩৬৪৪; মিশকাত হা/৫৭৭৯; ছহীহাহ হা/৩০০৫)*। ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) সেটা দেখেই তাকে আখেরী নবী ও সত্যনবী হিসাবে চিনেছিলেন এবং তাতে চুমু খেয়েছিলেন *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : ক্বিয়ামতের দিন জিন জাতি কি মানুষের মতই বিচারের সম্মুখীন হবে? তাদের নবী কে?

-খন্দকার আব্দুল মালেক
টুনিরহাট, পঞ্চগড়।

উত্তর : মানবজাতির ন্যায় জিন জাতিকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নামকে পূর্ণ করব' *(সাজদাহ ৩২/১৩)*। তিনি আরো বলেন, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেননি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনে সাক্ষাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতেন? *(আন'আম ৬/১৩০)*। উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিন জাতি বিচারের সম্মুখীন হবে, তারা জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। সূরা আহক্বাফের ৩১ আয়াতের আলোকে ইবনু কাছীর

Contents

(রহঃ) একথাকেই প্রধান্য দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর আহক্বাফ ৩১ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানব ও জিন সহ সমস্ত সৃষ্টির নিকটে নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন *(মুসলিম হা/৫২৩; তিরমিযী হা/১৫৫৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮)*। এছাড়া অন্যান্য নবীগণের সময়ে জিনেরা তাঁদের অনুসারী উম্মত ছিল।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : 'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কামারুযযামান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : 'তাহরীক' (تَحْرِيك) অর্থ আন্দোলন। 'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে The Movement অথবা That very Movement। অতএব 'আত-তাহরীক' বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন। যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে, যে মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে মেনে নিবে, দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে 'আত-তাহরীক' ইনশাআল্লাহ তাদেরই মুখপত্র।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : জানাযার ছালাতের সময় লাশ সামনে রেখে মৃতের ঋণ ও অছিয়ত ছাড়াও একজন পরিচালকের মাধ্যম সমাজের বিশিষ্টজন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। এরূপ কর্মকাণ্ড শরী'আতসম্মত কি?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ করা শরী'আতসম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে কোন আমল পাওয়া যায় না। যিনি ইমামতি করবেন, তিনি উপস্থিত জনসাধরণের উদ্দেশ্যে ঈমান বর্ধক সংক্ষিপ্তভাবে কিছু নছীহত করতে পারবেন। যাতে উপস্থিতগণ নিজেদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে পারেন *(বুখারী হা/৪৯৪৯; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৬৩০)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : মাসবূক ব্যক্তি ইমাম হ'তে পারবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করে যদি কেউ দেখেন যে, মুছল্লীগণ ছালাত আদায় করে নিয়েছেন ও মাসবূক তার বাকী ছালাত আদায় করছেন। এমতাবস্থায় তিনি জামা'আতের নেকীর আশায় মাসবূককে ইমাম করতে পারেন মর্মে বহু বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল পাওয়া যায় না।

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এটি ছহীহ নয়। কেউ বলেছেন, এটা ছহীহ। তবে উত্তমের বিরোধী'। (তিনি বলেন,) এটি ছহীহ হ'লেও সুন্নাতের চাইতে বিদ'আতের অধিক নিকটবর্তী। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম এমনটি করেননি। কোন ব্যক্তির যখন জামা'আতের কিছু অংশ ছুটে যায়, তখন তিনি বাকীটা একাকী দাঁড়িয়ে আদায় করেন। অতঃপর যদি মাসবূকের ইমামতি ছহীহ ধরা হয়, তাহ'লে এটাতে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে পরে যিনি প্রবেশ করবেন তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির, তারপর যিনি প্রবেশ করবেন তিনি তৃতীয় ব্যক্তির, অতঃপর চতুর্থ ব্যক্তির, এভাবে জামা'আত চলতেই থাকবে... *(ওছায়মীন, মুহাযারাতুল মাক্বরূআহ, লিকাউল বাবিল মাফতূহ-১২)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : সূদ গ্রহণ না করে কেবল হেফাযতের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কি?

- জাহাঙ্গীর আলম, নীলফামারী।

উত্তর : নিরুপায় অবস্থায় হেফাযতের উদ্দেশ্য ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা নিরূপায় হয়ে পড়লে তা স্বতন্ত্র কথা... *(আন'আম ১১৯)*। তবে অন্য কোন নিরাপদ ব্যবস্থা থাকলে না রাখাই কর্তব্য। কেননা এরূপ রাখার মাধ্যমে পাপের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ পাপের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : আদম (আঃ) আরশের পায়ায় লেখা কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দেখে বলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে 'মুহাম্মাদ' নামের অসীলায় মাফ করে দাও, তখন আল্লাহ তাকে মাফ করেন। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ার চর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫; হাকেম হা/৪২২, তাহকীক যাহাবী, সনদ জাল)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর চাচা আবু ত্বালেব যে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এর বিনিময়ে কি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন? তার অবস্থা কি হবে?

-রবীউল ইসলাম
বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জান্নাতবাসী হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালেব এর মৃত্যু মুশরিক অবস্থায় হয়েছিল। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর কারণে জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তি সর্বাপেক্ষা সহজতর হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবু ত্বালেবের। তাঁর দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে' *(বুখারী হা/৬৫৬২, মুসলিম হা/২১২, মিশকাত হা/৫৬৬৮)*। তিনি বলেন, যদি আমি না হ'তাম (অর্থাৎ শাফা'আত না থাকত), তাহ'লে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন। অতঃপর আমি তাকে নিম্নস্তর থেকে টাখনু পর্যন্ত উঠিয়ে আনি' *(মুসলিম হা/২০৯)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫)*।